অধ্যাপক গোলাম আযম

সীরাতুন্নবী (স) সংকলন

সীরাতুন্নবী (স) সংকলন

অধ্যাপক গোলাম আযম

কামিয়াব প্রকাশন
৩৪ নর্থব্রুক হল রোড, বাংলাবাজার, ঢাকা।

www.bjilibrary.com

বিসমিল্লাহির রাহমানির রাহীম

ইসলামে নবীর মর্যাদা

আল্লাহ তা'আলা মানব জাতিকে শান্তি ও কল্যাণের পথে পরিচালনা করার জন্য যে সুবন্দোবস্ত করেছেন তারই নাম নবুওয়াত ও রিসালাত। আল্লাহ পাক সরাসরি সব মানুষের নিকট ওহী পাঠাননি। মানুষের মধ্য থেকে কতক মানুষকে নবী ও রাসূল হিসেবে তিনি বাছাই করে নিয়েছেন এবং একমাত্র তাঁদের মারফতেই যাবতীয় উপদেশ, আদেশ ও নিষেধ পাঠিয়েছেন। নবী শব্দের অর্থ হলো সংবাদ বাহক আর রাসূল অর্থ হলো বাণী বাহক। আল্লাহ পাক মানব জাতির নিকট যা কিছু জ্ঞান ও নসিহত পাঠাতে চেয়েছেন তার বাহক হিসেবেই নবী ও রাসূলগণকে ব্যবহার করেছেন। তাঁদের মধ্যে সর্বশেষ ও সর্বশ্রেষ্ঠ নবী ও রাসূলই হলেন বিশ্বনবী হযরত মুহাম্মদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম।

কুরআন মাজীদে বার বার স্পষ্ট করে বলা হয়েছে যে, সমস্ত নবীকে একই উদ্দেশ্যে পাঠানো হয়েছে। দুনিয়ায় মানুষ হিসেবে জীবন যাপন করতে হলে ব্যক্তিগত ও সমষ্টিগতভাবে যে সব দায়িত্ব পালন করতে হয় তা কিভাবে করলে দুনিয়ায় শান্তি ও আখিরাতে মুক্তি পাওয়া যায়, সে বিষয়ে বাস্তব শিক্ষা দেওয়ার জন্যই নবীদেরকে নিযুক্ত করা হয়েছে। সে শিক্ষার মূলকথা হলো তিনটি ঃ

১. মানুষকে সব সময়, সব অবস্থায় ও সব কাজে একমাত্র আল্লাহ পাককে ইলাহ্ ও হুকুমকর্তা মনে করে তাঁরই অনুগত দাস হিসেবে জীবন যাপন করতে হবে। সন্তুষ্টচিত্তে ও মহব্বতের সাথে এ নীতি মেনে চলাকেই দুনিয়ার জীবনের সাফল্য মনে করতে হবে। আল্লাহর দাসত্বের পথ ত্যাগ করে বস্তুগত সুখ-সুবিধার পেছনে যারা দৌড়ায় মানুষ হিসেবে তাদের জীবন ব্যর্থ। ভালোমন্দের বিচারবোধ ও নীতিজ্ঞান দিয়েই রূহবিশিষ্ট মানুষকে পয়দা করা হয়েছে। একমাত্র আল্লাহর দাসত্বের ভিত্তিতে জীবন যাপন করলেই মানুষ হিসেবে সফলতা লাভ করা সম্ভব। নীতিহীন জীবন পশুর জন্যই মানায়। মানুষ হয়েও যারা নিয়ম-নীতি মেনে চলে না, তারা পশুর চেয়েও অধম।

   কুরআন মাজীদে বহু নবীর দাওয়াত ও শিক্ষা উল্লেখ করে দেখানো হয়েছে যে, তাঁরা সবাই একই ভাষায় আল্লাহকে একমাত্র ইলাহ্ হিসেবে স্বীকার করার জন্য আকুল আহ্বান জানিয়েছেন। সে কথাটি হলো ঃ يَاقَوْمِ اعْبُدُوا اللّٰهَ مَالَكُمْ مِنْ اِلٰهٍ غَيْرُهٗ

   "হে আমার দেশবাসী! একমাত্র আল্লাহর দাসত্ব কর। তিনি ছাড়া তোমাদের জন্য আর কোন ইলাহ্ বা হুকুমকর্তা নেই।" (আ'রাফ ঃ ৫৯)

২. নবীদের শিক্ষার দ্বিতীয় মূলকথা হলো নবীর আনুগত্য। সব নবীই মানুষকে ডেকে বলেছেন ঃ فَاتَّقُوا اللّٰهَ وَاَطِيْعُوْنِ

   "আল্লাহকে ভয় করে চল এবং আমাকে অনুসরণ কর।" (শুয়ারা ঃ ১০৮)

www.bjilibrary.com

প্রত্যেক নবীই আল্লাহর দাসত্ব করার একমাত্র উপায় হিসেবে নবীর আনুগত্য করার দাওয়াত দিয়েছেন। নবীকে সব সময়, সব অবস্থায় ও সব কাজে একমাত্র আদর্শ মানাই এর মূলকথা। আল্লাহকে প্রভু ও মনিব হিসেবে মানার একমাত্র মাধ্যম-ই নবী। আল্লাহ পাক যার কাছে ওহীযোগে হেদায়াত পাঠান, তিনিই আল্লাহর একমাত্র নির্ভরযোগ্য সরকারি প্রতিনিধি। তাই জীবনের সব ক্ষেত্রেই আল্লাহর দাসত্ব করতে হলে নবীর আনুগত্য করতেই হবে। অর্থাৎ আল্লাহকে একমাত্র প্রভু ও মনিব মানতে হলে নবীকে একমাত্র নেতা ও অনুসরণযোগ্য মানতেই হবে।

৩. নবীদের শিক্ষার তৃতীয় মূলকথা হলো আখিরাত। দুনিয়ার জীবনের সব চিন্তা ও কর্মের হিসাব-নিকাশ পরকালে যে দিতে হবে, সে বিষয়ে পূর্ণরূপে সচেতন হয়ে না চললে অনন্ত অসীম কাল চরম শাস্তি ভোগ করতে হবে। আল্লাহর দাসত্ব ও নবীর নেতৃত্বের নীতি মেনে চলতে হলে আখিরাতে জওয়াবদিহির চেতনাই প্রধান সম্বল। দুনিয়ার যাবতীয় অন্যায় ও পাপাচারের আকর্ষণ ত্যাগ করার প্রধান উপায়-ই হলো আখিরাতের চেতনা। কুরআন পাকে বার বার বলা হয়েছে যে, আখিরাতের জওয়াবদিহির অনুভূতি না থাকার ফলেই মানুষ পশুর মতো জীবন যাপন করে।

নবীদের শিক্ষার যে তিনটি মূলকথার সংক্ষিপ্ত পরিচয় দিলাম তা ইসলামী পরিভাষায় তাওহীদ, রিসালাত ও আখিরাত' নামে পরিচিত। এ তিনটির মধ্যে প্রথমটি আল্লাহ সম্পর্কের পরিচয় এবং তৃতীয়টি দুনিয়ার পরপারের নাম। এ দুটোর পরিচয় আমরা কোথায় পাই? আল্লাহ তো আকাশ থেকে আওয়াজ দিয়ে তাঁর পরিচয় জানাননি। আল্লাহকে জানতে হলে নবীর কাছেই যেতে হয়। নবী আল্লাহর যে পরিচয় দিয়েছেন সেটাই সঠিক পরিচয়। তা'হলে এ কথা না মেনে উপায় নেই যে, প্রকৃতপক্ষে নবীই মানুষকে চিনিয়ে দিয়েছেন যে, আল্লাহ বলতে কোন্ মহান সত্তাকে বুঝায়। আল্লাহ এ কথাও আওয়াজ দিয়ে জানিয়ে দেননি যে, মুহাম্মদ (স) তাঁর রাসূল। যে ওহীতে নবীর পরিচয় দেওয়া হয়েছে তাও মুহাম্মদ (স) থেকেই জানা গেছে। তা'হলে কি আমরা এ কথা মানতে বাধ্য নই যে, নবীই হলো ইসলামের মূল ভিত্তি? নবী ছাড়া আমরা আল্লাহকেও চিনতে পারি না। আল্লাহর সঠিক পরিচয় ও গুণাবলি শুধু নবীর নিকটই পাওয়া যায়।

তেমনিভাবে আখিরাত সম্পর্কে সঠিক ধারণা নবী ছাড়া আর কোথাও কি পাওয়ার উপায় আছে? দুনিয়ায় থাকাকালে মৃত্যুর পরপারের কোন খোঁজ-খবর জানা সম্ভব নয়। উঁকি মেরে পরকালের কিছুই দেখার পথ নেই। একমাত্র নবীর কাছে প্রেরিত ওহীর মারফতে পরকাল সম্পর্কে যতটুকু জানা যায়, এর বেশি আর কিছুই জানার উপায় নেই।

আলোচনা দ্বারা প্রমাণিত হলো যে, তাওহীদ ও আখিরাত সম্পর্কে জানার একমাত্র মাধ্যম হলো নবী। আর এ কথা সবাই স্বীকার করতে বাধ্য যে দীন-ইসলামের আসল ভিত্তি হলো তাওহীদ, রিসালত ও আখিরাত। ইসলামের এ তিনটি মূলভিত্তির মধ্যে দু'টো মূলভিত্তির পরিচয় যার মাধ্যমে পাওয়া যায়, তিনিই মানুষের নিকট দীনের প্রথম ভিত্তি। আল্লাহ পাক যাকে নবী নিযুক্ত করেন তাঁর মারফতেই তিনি মানুষের কাছে পৌঁছেন। মানুষ পয়লা নবীর উপরই ঈমান আনে। নবীর কথা, কাজ ও চরিত্র যাদেরকে আকৃষ্ট করে

www.bjilibrary.com

তারা প্রথমে নবীকেই চিনে। নবীকে মেনে নিলে নবীর কাছ থেকেই আল্লাহকে চেনা যায়। এ হিসাবে দীন-ইসলামের পয়লা ভিত্তিই হলো নবী। নবীই ইসলামের ধারক, বাহক ও নমুনা।

পূর্ণাঙ্গ জীবন বিধান হিসেবে ইসলামের সবটুকু শিক্ষা নবীর কাছ থেকেই পাওয়া যায়। এমনকি আল্লাহ সম্বন্ধেও সঠিক ধারণা নবী থেকেই পেতে হয়। সুতরাং দীন ইসলামের ব্যাপারে নবীর নিকট আল্লাহই মূলভিত্তি হলেও, নবী ছাড়া আর সবার নিকট নবীই মূলভিত্তি। এ কারণেই নবুওয়তের প্রতিষ্ঠানটিই (Institution of prophethood) হলো ইসলামের প্রথম, প্রধান ও আসল ভিত্তি। দীন ইসলামের সমগ্র কাঠামো এবং এর বাস্তব ও বিস্তারিত রূপ বিশুদ্ধ অবস্থায় একমাত্র নবীর জীবনেই পাওয়া যায়।

সীরাতুন্নবী উপলক্ষে এ বিষয়টি নিয়েই আলোচনার গুরুত্ব আমি সবচেয়ে বেশি মনে করি। কারণ মুসলিমদের মধ্যে নবীর প্রতি শ্রদ্ধা, ভক্তি ও মহব্বত খুব বেশি থাকা সত্ত্বেও নবীর প্রকৃত মর্যাদা সম্পর্কে অনেক দীনদার লোকের ধারণাও স্পষ্ট নয়। আল্লাহ পাকের কিতাব কুরআন মাজীদ বিশুদ্ধ অবস্থায় থাকা সত্ত্বেও এবং সহীহ হাদীসের মাধ্যমে নবীর জীবন ও ইতিহাস সংরক্ষিত থাকা সত্ত্বেও উম্মতে মুহাম্মদীর সবার নিকট নবীর প্রকৃত মর্যাদা, অবস্থান ও পজিশন বহাল নেই। সাধারণ মুসলমানের পক্ষে ইসলামের সঠিক ইল্‌ম হাসিলের সুযোগ না থাকায় এ বিষয়ে তাদের ধারণা অস্পষ্ট হওয়াই স্বাভাবিক। এর জন্য তাদেরকে দায়ী বা দোষী মনে করা চলে না। কিন্তু যারা কোন না কোনভাবে দীনের খেদমত করছেন, এমন কি যারা আলেম, ইমাম, ওয়ায়েয, মুদার্‌রিস হিসেবে দীনের তালিম দিচ্ছেন তাদের সবাই যদি নবীর প্রকৃত মর্যাদা সম্পর্কে সঠিক ধারণা পেশ করতে পারতেন তাহলে আজ দীন ইসলামের এ দুর্গতি হতো না।

বর্তমানে উম্মতে মুহাম্মদীর সবচেয়ে বড় রোগই হলো নবীর সঠিক মর্যাদা বুঝবার অভাব। আল্লাহ পাক নবীকে যে মর্যাদা দিয়েছেন সে মর্যাদাই হলো নবীর প্রকৃত পজিশন। আসুন, আমরা কুরআন পাক থেকে বুঝবার চেষ্টা করি যে, আল্লাহ তাআলা নবীকে কি পজিশন দিয়েছেন।

১. এ বিষয়ে পয়লা কথাই হলো যে, নবী অন্যান্য মানুষের মতোই একজন মানুষ ছিলেন। তিনি অতিমানব ছিলেন না। সব মানুষের মতোই তিনি পিতার ঔরসে মাতার গর্ভে জন্ম নিয়েছেন। শৈশব, কৈশোর ও যৌবনকাল তাঁরও ছিল। খাওয়া, পরা, ঘুম ও বিশ্রামের প্রয়োজন যেমন সব মানুষের জীবনেই দেখা যায়, তেমনি নবীর জীবনেও ছিল। রোগ-শোক, দুঃখ-বেদনা থেকেও তিনি মুক্ত ছিলেন না। বিয়ে করা ও সন্তান লালন-পালন করার ঝামেলাও তাঁকে পোহাতে হয়েছে। দুশমনদের পাথরে তাঁর দেহ থেকে রক্ত ঝরেছে, যুদ্ধে তাঁর দাঁত ভেঙেছে এবং শরীর জখমও হয়েছে। তিনি যদি আর সব মানুষের মতই একজন মানুষ না হতেন তাহলে এসব তাঁর জীবনে দেখা যেত না। তিনি বাতিল সমাজ ব্যবস্থা বদলিয়ে ইসলামী রাষ্ট্র ও গভর্নমেন্ট কায়েম করতে গিয়ে বাতিল শক্তির সাথে সংঘর্ষ করতে বাধ্য হয়েছেন। সমাজ ব্যবস্থার পরিবর্তনের জন্য স্বাভাবিক কারণেই যে ধরনের আন্দোলন ও সংগ্রাম

www.bjilibrary.com

করতে হয়, তাঁকেও সে রকমই করতে হয়েছে। কোন মন্ত্রের জোরে বা কোন ইস্‌ম পড়ে ফুঁ দিয়ে তিনি বাতিল শক্তিকে পরাজিত করেননি। তাঁকে রীতিমতো যুদ্ধ করতে হয়েছে।

তাঁর সমগ্র জীবন একথা প্রমাণ করে যে, তিনি একজন স্বাভাবিক মানুষ হিসেবেই নবুওয়াতের কঠিন দায়িত্ব পালন করেছেন। তাঁর জীবনে আল্লাহর পক্ষ থেকে যেসব মোজেযা প্রকাশ করা হয়েছে, তা নবীর পরিচয় বহন করে বটে কিন্তু তা সত্ত্বে মানুষ হিসাবে তাঁর সংগ্রামী জীবন মোজেযা দ্বারা পরিচালিত নয়।

রক্তমাংসে গড়া একজন মানুষ হিসাবে যদি তিনি পরিচিত না হতেন তাহলে বাস্তব জীবনে মানুষ তাঁকে অনুসরণ করা সম্ভব বলে মনে করতে পারতো না। আর দশজন মানুষের মতো মানুষ ছিলেন বলেই তিনি মানুষের জন্য আদর্শ হতে পেরেছেন। সাধারণ মানুষের জীবনে যে সব সমস্যা ও অসুবিধা তা যদি নবীর জীবনে না থাকতো, তাহলে মানুষ তাঁকে অনুসরণ করা কিছুতেই সম্ভব মনে করত না। আল্লাহ্ পাক তাঁর জীবনকে সাধারণ মানুষের চেয়ে বেশি কঠিন করে দিয়েছেন। তিনি এমন এতীম ছিলেন, যার পিতা জন্মের পূর্বেই মারা যান এবং মাতা শৈশবকালেই দুনিয়া থেকে বিদায় নেন। ২৫ বছর বয়স পর্যন্ত তাঁর জীবন সচ্ছল ছিল না। বিয়ের পর বিবি খাদীজা (রা)-এর অবস্থা ভাল থাকায় তিনি কিছুদিন সচ্ছলতার মুখ দেখলেও নবুওয়তের জীবনে বিবি খাদীজার সম্পত্তিও ইসলামী আন্দোলনে খরচ হয়ে যায়। তিনি গোটা জীবন এমন সহজ-সরলভাবে কাটিয়েছেন যে, কোন মানুষ এ কথা বলতে পারবে না যে, অভাব বা অন্যান্য সমস্যার কারণে তাঁকে অনুসরণ করা অসম্ভব।

তাঁকে সাধারণ মানুষের মতোই স্বাভাবিক সহজ জীবন যাপন করতে দেখে কাফেররা বলতো যে, "এ আবার কেমন নবী? যে আমাদের মতোই খায়-দায়, রাস্তায় হাঁটে ও বাজারে যায়। সে যদি নবী হতো তাহলে ফেরেশতা কেন তাঁর আর্দালী হয়ে আসে না বা তাঁর জন্য কেন সোনা রুপার দালানকোঠা তৈরি হয় না?" এসব কথার জওয়াব কুরআনে দেওয়া হয়েছে যে, মানুষের হেদায়াতের জন্য মানুষেরই নবী হতে হবে। তিনি যে অতিমানব নন এবং আর সবার মতোই একজন মানুষ সে কথা ঘোষণা করার জন্য আল্লাহ্ পাক তাঁকে হুকুম দিলেন ঃ

قُلْ اِنَّمَا اَنَا بَشَرٌ مِّثْلُكُمْ يُوْحٰى اِلَىَّ -

"হে নবী! আপনি বলে দিন যে, আমি তোমাদেরই মতো একজন মানুষ। শুধু একটি বিষয়ে আমি তোমাদের থেকে আলাদা তা হলো আমার নিকট ওহী আসে, তোমাদের কাছে আসে না।" আমি আল্লাহর কাছ থেকে নির্ভুল জ্ঞান পাই, তোমরা তা পাও না। (আল কাহাফ ঃ ১১০)

সুতরাং নবীর পজিশন পরিষ্কার করে বলা হয়েছে যে, তিনি মাটির মানুষ; তিনি ফেরেশতা বা জিন নন। মানুষের নেতা ও আদর্শ হিসাবে তাঁকে মানবরূপেই পাঠানো হয়েছে।

www.bjilibrary.com

রাসূল (স) মাটির মানুষ ছিলেন বলে কতেক লোক স্বীকার করতে চান না। তাদের ধারণা যে, তিনি নূরের তৈরি। আল্লাহ পাক স্পষ্টভাবে জানিয়ে দিয়েছেন যে, ফেরেশতা হলো নূরের তৈরি, জিন হলো 'নার' বা আগুনের তৈরি এবং মানুষ মাটির তৈরি।

রাসূল (স) বিদায় হজ্জের বিখ্যাত ভাষণে ঘোষণা করেছেন যে, "তোমরা সবাই আদমের সন্তান, আর আদম ছিলেন মাটির তৈরি।"

রাসূল (স) নিজেও আদমের সন্তান হিসাবে মাটির তৈরি মানুষ ছিলেন। অবশ্য এ কথা ঠিক যে, নবুওয়তের যে মর্যাদা তা নিশ্চয়ই আল্লাহর বিশেষ নূর। কিন্তু রাসূল (স)-এর দেহ আর সব মানুষের মতো মাটির তৈরিই ছিল। তা না হলে সূরা কাহাফের ১১০ নম্বর আয়াতে "আমি তোমাদেরই মতো মানুষ" এ কথার অর্থ আর কী হতে পারে?

এ বিষয়ে আরও কয়েকটি আয়াতের উল্লেখ করা যেতে পারে ঃ

هَلْ كُنْتُ اِلَّا بَشَرًا رَسُوْلًا ـ

"আমি কি বাণী বাহক (রাসূল) মানুষ ছাড়া আর কিছু?" (বনী ইসরাঈল ঃ ৯৩)

وَمَا مَنَعَ النَّاسَ اَنْ يُؤْمِنُوْا اِذْ جَاءَهُمُ الْهُدٰى اِلَّا اَنْ قَالُوْا اَبَعَثَ اللّٰهُ بَشَرًا رَسُوْلًا ـ

"মানুষের সামনে যখনই হেদায়াত এসেছে তখন একমাত্র এ কথাটিই তাদেরকে ঈমান আনতে বাধা দিয়েছে যে, আল্লাহ কি মানুষকে রাসূল বানিয়ে পাঠিয়েছেন?" (বনী ইসরাঈল ঃ ৯৪)

এ আয়াতে স্পষ্ট করে বলা হয়েছে যে, কোন মানুষকে রাসূল হিসাবে মেনে নিতে তারা রাযী ছিল না।

আজও যারা রাসূলুল্লাহ (স)-কে মাটির মানুষ বলে স্বীকার করেন না, তারা ঐ আয়াত অনুযায়ী নিজেদেরকে কোন পর্যায়ে নিয়ে যাচ্ছেন তা কি ভেবে দেখবেন?

২. নবীর মর্যাদা নির্ধারণ করতে গিয়ে আল্লাহ পাক জানিয়ে দিলেন যে,

وَمَا اَرْسَلْنَا مِنْ رَّسُوْلٍ اِلَّا لِيُطَاعَ بِاِذْنِ اللّٰهِ ـ

"হে নবী! আমি আপনাকে এজন্য পাঠিয়েছি, যাতে আমার নির্দেশ মোতাবেক মানুষ আপনার আনুগত্য করে।" (আন নিসা ঃ ৪)

নবীকে শুধু ভক্তি ও মহব্বত করার জন্য পাঠানো হয়নি। তাঁকে পূর্ণরূপে অনুসরণ করাই আল্লাহর নির্দেশ। আল্লাহ তাআলা আরও বলেছেন ঃ

مَنْ يُطِعِ الرَّسُوْلَ فَقَدْ اَطَاعَ اللّٰهَ ـ

"যে রাসূলের আনুগত্য করছে সে আল্লাহরই আনুগত্য করছে।" অর্থাৎ দাসত্ব করার একমাত্র পথই হলো রাসূলকে মেনে চলা। (আন নিসা ঃ ৮০)

www.bjilibrary.com

এখন প্রশ্ন হলো, রাসূলকে মানা বা তাঁর আনুগত্য করার অর্থ কি? রাসূলকে কেবল ধর্মীয় বিষয়ে মেনে চলাই কি যথেষ্ট? নামায, রোযা, যিকর, তাসবীহ, তেলাওয়াত ও তাহাজ্জুদের বেলায় নবীর আনুগত্য করা যেমন জরুরী, জীবনের অন্যান্য দিকে নবীকে মেনে চলা তেমনি দরকারি কিনা? এ প্রশ্নের স্পষ্ট জওয়াব কুরআনেই দেওয়া হয়েছে ঃ

اُدْخُلُوْا فِى السِّلْمِ كَآفَّةً

"ইসলামে পূর্ণরূপে দাখিল হও।" (আল বাকারা ঃ ২০৮)

রাসূলের গোটা জীবনটাই ইসলাম। তাঁর নামায, রোযা যেমন ইসলামের অন্তর্ভুক্ত; ইসলামবিরোধী শক্তির বিরুদ্ধে তাঁর সংগ্রাম, সমাজ থেকে যুলুম ও শোষণ খতম করার জন্য তাঁর দীর্ঘ চেষ্টা, ইনসাফপূর্ণ রাষ্ট্র পরিচালনার জন্য তাঁর আজীবন সাধনা, ইসলামী রাষ্ট্র ও সমাজ ব্যবস্থাকে হেফাযত করার জন্য বাতিল শক্তির বিরুদ্ধে তাঁর যুদ্ধ করাও তেমনি ইসলামেরই অংশ। মুহাম্মাদুর রাসূলুল্লাহ (স) কি শুধু মসজিদে ইমামতি করার সময়ই নবী ছিলেন? দেশ শাসনের বেলায় কি তিনি নবী ছিলেন না?

কুরআন স্পষ্ট ঘোষণা করেছে যে, নবী যে বিষয়েই মানুষকে কোন কথা বলেছেন তা আল্লাহর দেওয়া ওহীর জ্ঞানের ভিত্তিতেই বলেছেন ঃ

وَمَا يَنْطِقُ عَنِ الْهَوٰى ـ اِنْ هُوَ اِلَّا وَحْىٌ يُّوْحٰى ـ

"নবী যখন কথা বলেছেন, তিনি মনগড়া কিছু বলেননি। যা বলেছেন সবই আল্লাহর পক্ষ থেকেই বলেছেন।" (আন নাজ্‌ম ঃ ৩-৪)

সুতরাং নবীকে মানার অর্থ হলো, জীবনের সব দিক ও বিভাগেই তাঁর আনুগত্য করা। সব ব্যাপারেই যেমন আল্লাহকে মনিব মানতে হবে, তেমনি সব বিষয়েই নবীকে আদর্শ নেতা মেনে চলতে হবে। তাই আমরা দেখতে পাই যে, যারা মদীনার মসজিদে নবীর ইমামতিতে নামায আদায় করার পর ওহুদের যুদ্ধে যাবার সময় পথ থেকে ফিরে এল তাদেরকে মুমিন বলে স্বীকারই করা হয়নি; তাদেরকে মুনাফিক বলে ঘোষণা করা হলো।

কুরআন ও হাদীসে এ কথা অত্যন্ত স্পষ্ট যে, আল্লাহ তাআলা নবীকে এ মর্যাদাই দিয়েছেন যে, তাঁকে পূর্ণরূপে মেনে চলতে হবে। ব্যক্তি জীবন, পারিবারিক জীবন, রাষ্ট্রীয় ও অর্থনৈতিক জীবন এবং জীবনের অন্যান্য সমস্ত দিকে নবীকেই একমাত্র অনুসরণযোগ্য হিসেবে মেনে চলাই আল্লাহর নির্দেশ। কোন এক ক্ষেত্রেও যদি নবীকে কেউ মানতে অস্বীকার করে, তাহলে সে মুসলিম হিসাবে গণ্য হবে না। আল্লাহ পাক বলেন ঃ

وَمَا كَانَ لِمُؤْمِنٍ وَّلَا مُؤْمِنَةٍ اِذَا قَضَى اللّٰهُ وَرَسُوْلُهٗ اَمْرًا اَنْ يَّكُوْنَ لَهُمُ الْخِيَرَةُ مِنْ اَمْرِهِمْ ـ

"কোন বিষয়ে আল্লাহ ও তাঁর রাসূল যখন কোন সিদ্ধান্ত দেন তখন কোন মুমিন পুরুষ বা নারীর এ অধিকার নেই যে, সে ঐ বিষয়ে নিজের আলাদা মত খাটাবে।" (আহযাব ঃ ৩৬)

www.bjilibrary.com

মোটকথা সব সময়, সব অবস্থায় ও সব ব্যাপারে নবীকে মেনে চলাই হলো ইসলামের দাবি। যেখানেই নবীকে অমান্য করা হয় সেখানে প্রকৃতপক্ষে শয়তানকেই অনুসরণ করা হয় বলে কুরআনে ঘোষণা করা হয়েছে ঃ

اُدْخُلُوْا فِى السِّلْمِ كَافَّةً ص وَلَاتَتَّبِعُوْا خُطُوٰتِ الشَّيْطَانِ ـ

"তোমরা ইসলামকে পূর্ণরূপে কবুল কর এবং শয়তানের পদাঙ্ক অনুসরণ করো না।" (বাকারা ঃ ২০৮)

এ দ্বারা বুঝা গেল যে, মানুষের জন্য দু'রকম পথই আছে। হয় নবীর পথে চলবে, আর না হয় শয়তানের পথ ধরবে। এর মাঝামাঝি কোন পথ নেই। নবীর অনুসরণ না করে যখনই কেউ নিজের নফ্স বা অন্য মানুষের আনুগত্য করবে তখনই তা শয়তানের দাসত্ব বলে গণ্য হবে।

৩. নবীর মর্যাদার ব্যাপারে তৃতীয় গুরুত্বপূর্ণ বিষয় হলো এই যে, নবীকে যেভাবে মানা হয় সেভাবে আর কাউকে মানা যাবে না। নবী আল্লাহর ওহী দ্বারা পরিচালিত হবার দরুন তিনি নির্ভুল। আল্লাহ ও তাঁর রাসূলের আনুগত্য বিনা শর্তে করতে হয়। তাঁদের আদেশ ও নিষেধের যুক্তি বুঝে আসুক বা না আসুক, তাঁদের হুকুম হলে তা অবশ্যই মানতে হবে। এখানে মুমিনের পছন্দ-অপছন্দের কোন এখতিয়ার নেই। আল্লাহ নিজেও ভুল করেন না, তাঁর রাসূলকেও ভুল পথে চলতে দেন না। তাই রাসূলকে মানার ব্যাপারে মনে কোন সন্দেহ বা দ্বিধা থাকা চলবে না। কোন বিষয়ে রাসূল কোন নির্দেশ দিয়ে থাকলে তা অন্ধভাবেই মেনে নিতে হবে। 'রাসূল বলেছেন' এতটুকু যুক্তিই মুমিনের জন্য যথেষ্ট। রাসূলের নির্দেশের যুক্তি বুঝতে না পারলে মুমিনের বুঝবার যোগ্যতার অভাবই মনে করতে হবে।

রাসূলকে অন্ধভাবে মানবার এ নীতি আর কোন মানুষের বেলায়ই খাটে না। যে রাসূল নয়, তার নিকট ওহী আসে না বলে তাকে নির্ভুল মনে করা চলে না। তাই নবী ছাড়া আর সবাইকে মানবার নীতি আলাদা। সে নীতি হলো– طَاعَةٌ بِالْمَعْرُوْفِ অর্থাৎ আল্লাহ ও রাসূলের হুকুমের পক্ষে না বিপক্ষে সে কথা ভালভাবে বিবেচনা করেই অন্যান্য মানুষের আনুগত্য করতে হবে। তাই নবী ছাড়া আর কোন মানুষকে বিনা যুক্তিতে অন্ধভাবে মানা চলবে না। অনুসরণযোগ্য ও সত্যের মাপকাঠি হিসাবে একমাত্র রাসূলকেই মানতে হবে। কুরআনে স্পষ্ট ঘোষণা করা হয়েছে ঃ

لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِى رَسُوْلِ اللّٰهِ اُسْوَةٌ حَسَنَةٌ ـ

"তোমাদের জন্য আল্লাহর রাসূলের মধ্যে সুন্দরতম আদর্শ রয়েছে।" (আল আহযাব ঃ ২১)

সকল দিক দিয়ে রাসূলকেই উৎকৃষ্টতম আদর্শ হিসাবে গ্রহণ করতে হবে। অন্য মানুষ ততটুকুই অনুসরণযোগ্য যতটুকু তারা রাসূলের আদর্শ মেনে চলেন। 'উসওয়াতুন হাসানা' একমাত্র রাসূল। এ মর্যাদা আর কোন মানুষের হতে পারে না।

www.bjilibrary.com

কবর থেকে শুরু করে মীযান পর্যন্ত এ হিসাবই দিতে হবে যে, রাসূলকে অনুসরণ করা হয়েছে কিনা।

রাসূল ছাড়া আর সবার আনুগত্যই শর্ত সাপেক্ষ। সে শর্তটি হলো রাসূলের আদর্শ। পিতা-মাতা, মসজিদের ইমাম, দেশের শাসক ইত্যাদিকে বিনা শর্তে মানা যাবে না। যদি তারা রাসূলের আদেশ-নিষেধের বিরোধী হুকুম না করেন তাহলে তাদেরকেও মানতে হবে। কিন্তু এর বিপরীত হুকুম করলে কাউকেই মানা চলবে না।

এখানে প্রশ্ন হতে পারে যে, অনুসরণ করার ব্যাপারে রাসূলের পর সাহাবায়ে কেরাম, তাবেয়ীন, ইমামগণ ও অন্যান্য দীনি ব্যক্তিকে কী মর্যাদা দেওয়া হবে? তাঁরা আমাদের জন্য আদর্শ ও সত্যের মাপকাঠি কিনা? এ কথা ভালোভাবে বুঝে নিতে হবে যে, আমরা সাহাবায়ে কেরাম ও ইমামগণকে কী উদ্দেশ্যে মানি? তাঁদের মর্যাদা কি রাসূলের সমান? তারা কি রাসূলের মতই নির্ভুল?

এ বিষয়ে কোন সন্দেহ নেই যে, সাহাবায়ে কেরাম ও ইমামগণ দীনের অনুসরণের ব্যাপারে আমাদের জন্য আদর্শ। কিন্তু তাঁরা কি রাসূলের সমান মানের আদর্শ? নিশ্চয়ই নয়। আসল আদর্শ একমাত্র রাসূল। রাসূলকে মানার জন্যই সাহাবায়ে কেরাম ও ইমামগণকে মানার প্রয়োজন। কারণ, তাঁরা রাসূলকে অনুসরণ করার ব্যাপারে আদর্শ স্থাপন করেছেন। দীনের প্রকৃত আদর্শ রাসূল আর রাসূলকে মেনে চলার ব্যাপারে সাহাবাগণ অবশ্যই শ্রেষ্ঠ আদর্শ। কিন্তু সাহাবীগণকে মানা আসল উদ্দেশ্য নয়। একমাত্র রাসূলকে মানাই মূল উদ্দেশ্য। রাসূলকে মানার জন্যই সাহাবায়ে কেরামকে মানতে হবে।

রাসূলের পর সাহাবায়ে কেরাম ও ইমামগণকে দীনের ওস্তাদ হিসাবেই মানতে হবে। সব যুগেই হক্কানী ওলামা ও মাশায়েখ দীনের ওস্তাদ বা শিক্ষক। দুনিয়ার সব বিষয়েই যেমন শিক্ষকের দরকার হয়, তেমনি দীন শিখবার জন্যও অবশ্যই শিক্ষক প্রয়োজন। প্রকৃতপক্ষে রাসূলের জীবনই হলো দীনের জীবন্ত ও বাস্তব রূপ। সাহাবায়ে কেরাম, ইমামগণ এবং যুগে যুগে আলেমগণ ঐ দীনেরই ওস্তাদ; তারা নিজেরা দীনের প্রতীক নন। তারা রাসূলের জীবন থেকেই শিক্ষা দেন।

রাসূল এবং দীনের ওস্তাদগণের মর্যাদার পার্থক্য সম্পর্কে ভালোভাবে সজাগ-সচেতন না থাকলে স্বাভাবিকভাবেই অন্যান্য দীনি ব্যক্তিত্বকে অন্ধভাবে মানার কুপ্রথা বা বিদআত চালু হয়ে যায়। ইসলামের যে কোন একদিকের বড় খেদমতের ফলে কোন ব্যক্তি মানুষের ভক্তি ও শ্রদ্ধার পাত্র হয়ে গেলে তাঁকেই আদর্শ বলে গ্রহণ করা হয়। অথচ কোন মানুষই রাসূলের মতো সকল দিকে আদর্শ হতে পারে না। কেউ হয়তো ব্যক্তিগত জীবনে ধার্মিক ও আবেদ হিসাবে অত্যন্ত উন্নত হলেও ইসলামের সামাজিক ও রাষ্ট্রীয় বিষয়ে কোন চেষ্টাই করেননি। কেউ আজীবন কুরআনের মুফাস্‌সির হিসাবে বিখ্যাত হওয়া সত্ত্বেও ইকামাতে দীনের দায়িত্ব পালনের খেয়ালই করেননি। আবার কেউ মুহাদ্দিস হিসাবে সারা জীবন হাদীসের খেদমত করেছেন; কিন্তু দীনের ব্যাপারে হয়তো আর কিছুই করেননি। হয়তো কোন কোন দীনি ব্যক্তিত্ব

www.bjilibrary.com

নিজ নিজ কর্মক্ষেত্রে যোগ্যতা ও নিষ্ঠার ফলে স্বাভাবিকভাবেই সকলের প্রশংসা পেয়েছেন এবং এত শ্রদ্ধা ও ভক্তি পেয়েছেন যে, তারা লক্ষ লক্ষ মানুষের নিকট আদর্শ মানুষ হিসাবে গণ্য হয়েছেন। অথচ তাঁরা নবীর জীবনের এক দিকেই উন্নতি করেছেন; অন্য দিক দিয়ে নবীর নমুনা তাদের জীবনে পাওয়া যায় না। কিন্তু কালক্রমে এ জাতীয় মহান ব্যক্তিরা অন্যদের নিকট এমন আদর্শ বলে গণ্য হয়ে যান যে, তাদের অনুকরণ করতে গিয়ে বহুলোক রাসূলের জীবনের একাংশ নিয়েই সন্তুষ্ট থাকেন। কিন্তু যদি রাসূলকে একমাত্র আদর্শ মনে করা হতো তাহলে অন্যদের থেকে দীনের যেটুকু শিক্ষা পাওয়া গেল, সেটুকুকেই যথেষ্ট মনে না করে রাসূলের জীবনের অন্যান্য অংশ ও দিকের অনুসরণের গুরুত্ব উপলব্ধি করা সম্ভব হতো।

রাসূলকে একমাত্র আদর্শ ও উসওয়া মনে না করার ফলে ঐসব দীনি ব্যক্তিত্ব যে টুকু দীনের খেদমত করেছেন, সেটুকুকেই আদর্শ মনে করা হয়। তখন রাসূলের আসল ও বড় কাজের গুরুত্ব উপলব্ধি করা অসম্ভব হয়ে পড়ে। তাই দেখা যায় যে, দীনের বহু মুখলিস খাদেম বিভিন্ন বড় বড় দীনি ব্যক্তিত্বকে অনুসরণ করে তাদের অনুকরণে ঐটুকু কাজ করাকেই যথেষ্ট মনে করেছেন যেটুকু ঐ বুজুর্গগণ করে গেছেন। আল্লাহর রাসূল প্রধানত যে কাজের জন্য দুনিয়ায় এসেছিলেন, সে কাজটিকে তারা এ জন্যই প্রয়োজনীয় গুরুত্ব দেন না।

هُوَ الَّذِىْ اَرْسَلَ رَسُوْلَهٗ بِالْهُدٰى وَدِيْنِ الْحَقِّ لِيُظْهِرَهٗ عَلَى الدِّيْنِ كُلِّهٖ ـ

আল্লাহ তাআলা কুরআন মজীদের তিনটি সূরার মধ্যে (তওবা ঃ ৩৩, ফাতহ্ ঃ ২৮ ও সাফ ঃ ৯) বলেছেন যে, "তিনিই সে সত্ত্বা (আল্লাহ) যিনি তাঁর রাসূলকে হেদায়াত ও একমাত্র হক দীন দিয়ে পাঠিয়েছেন, যাতে আর সব দীনের উপর এ দীনকে বিজয়ী করেন।" এ আয়াত দ্বারা এ কথা সুস্পষ্ট করে দেওয়া হয়েছে যে, দীন-ইসলাম মানব রচিত অন্যান্য ব্যবস্থার অধীনে যতটুকু অনুমতি পাওয়া যায় শুধু ততটুকুর উপর আমল করার জন্য পাঠানো হয়নি। আল্লাহর দীনকে আল্লাহর যমীনে বিজয়ী করে অন্যান্য সব বিধানকে এর অধীনে রাখার জন্য রাসূলকে পাঠানো হয়েছে। এ কাজটির নামই ইকামতে দীন। তাই দীনকে কায়েম করার দায়িত্ব দিয়েই নবীকে পাঠানো হয়েছে। নবীর উম্মতেরও ঐ একই দায়িত্ব। এ দায়িত্বকে অবহেলা করার প্রধান কারণই হলো রাসূলকে একমাত্র আদর্শ মনে না করা। যদি রাসূলকেই প্রকৃত আদর্শ মনে করা হয় তাহলে এ দায়িত্ব পালনের চেষ্টা না করলেও দীনের দায়িত্ব পালন করা হলো বলে কী করে ধারণা হতে পারে ?

আল্লাহ তাআলা তার শেষ নবী মুহাম্মদ (স)-এর মর্যাদা সম্পর্কে যত কথা বলেছেন তার মধ্যে মাত্র তিনটি পজিশনকেই এ আলোচনায় বেশি গুরুত্বপূর্ণ হিসাবে পেশ করা হয়েছে। প্রথমত, তিনি আমাদের মতো স্বাভাবিক মানুষ ছিলেন। দ্বিতীয়ত, তিনি মানব জীবনের সব ক্ষেত্রের জন্যই আদর্শ ছিলেন। তৃতীয়ত, একমাত্র তিনিই প্রকৃত আদর্শ আর যারা এ আদর্শের অনুসরণ করেন তারা নিজেরা ঐ মানের আদর্শ নন।

www.bjilibrary.com

আল্লাহ পাক যেমন তার যাত ও সিফাতে একক, তেমনি রাসূলও তাঁর বৈশিষ্ট্যে একক। আল্লাহর সাথে তাঁর সত্তা ও গুণাবলিতে আর কাউকে শরীক করা যেমন তাওহীদের খেলাফ; উসওয়াতুন হাসানা রাসূলের সাথে আর কাউকে শরীক করাও তেমনি রিসালাতের খেলাফ। রাসূল এমন এক বৈশিষ্ট্যের অধিকারী যে, তিনি ছাড়া আর কাকেও সে মর্যাদা দেওয়া যায় না। নবুওয়াত ও রিসালাত এমন এক কষ্টিপাথর যে, আর সব মানুষকে ঐ কষ্টিপাথরে বিচার করেই তাদের দীনি মান নির্ধারণ করতে হয়। নবুওয়তের কষ্টিপাথরে যাচাই করে জানা যায় যে, সাহাবায়ে কেরাম অবশ্যই খাঁটি সোনা। কিন্তু তারা রাসূলের মতো কষ্টি পাথর নন। রেসালাতের মাপকাঠিতে বিচার করে এ কথা স্বীকার করতেই হবে যে সাহাবায়ে কেরাম দীনের সর্বোচ্চ মর্যাদায় উত্তীর্ণ; কিন্তু দীনের মাপকাঠি বা মানদণ্ড একমাত্র রাসূল, সাহাবায়ে কেরাম মাপকাঠি নন।

আল্লাহ তাআলা তাঁর রাসূলকে যে মর্যাদা বা পজিশন দিয়েছেন এটা যথাযথ বহাল রাখার উপরই দীনের যথার্থ অস্তিত্ব নির্ভর করে। দীনের ভারসাম্য বহাল রাখতে হলে নবীর এ মর্যাদার হেফাযত করতেই হবে। আজ মুসলিম মিল্লাতের মধ্যে দীন ইসলামের যে দুর্দশা দেখা যায়, নবীর যথাযথ মর্যাদা বহাল না থাকাই এর আসল কারণ। রাসূলের এ মর্যাদা রক্ষার অভাবেই আজ মুসলিম জাতির মধ্যে ইসলামের সঠিক ধারণা, উদ্দেশ্য ও লক্ষ্যের ব্যাপারে এত মতভেদ দেখা যায়। মুসলমানদের মধ্যে এত ফেরকা ও বিভেদের আসল কারণই এখানেই। এ জন্য আমি এত জোর দিয়ে বলতে চাই যে, রাসূলই হচ্ছেন দীনের মূলভিত্তি। রাসূলকে আল্লাহ পাক যে মর্যাদা দিয়েছেন ঠিক সে পজিশনে তাঁকে রাখার উপরই ইসলামের বিশুদ্ধতা, ব্যাপকতা ও ভারসাম্য সম্পূর্ণরূপে নির্ভর করে। ভারসাম্যের অভাবেই মুসলমানদের জীবনে আজ বাস্তবে ইসলামের প্রভাব ও প্রাধান্য এত সামান্য। বর্তমানে অধিকাংশ মুসলমানই নামে মাত্র মুসলিম। প্রকৃত মুসলিমের ভূমিকা পালনের যোগ্যতা এ জন্যই এত কম দেখা যায়।

এখানে একটা প্রশ্ন অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। দুনিয়ার কোটি কোটি মুসলমানের অন্তরে ইসলামের জন্য দরদ ও মহব্বত থাকা সত্ত্বেও তাদের বাস্তব জীবনে ইসলামী আদর্শের ছাপ এত কম কেন? এর জন্য কি সাধারণ মুসলমানরা বেশি দায়ী, না দীনের খাদেমগণ বেশি দায়ী? আমার সুচিন্তিত ধারণা যে, দীনের খাদেমগণই বেশি দায়ী। তারা সবাই রাসূলের বাস্তব জীবনের আদর্শ যদি জনগণের সামনে পেশ করতে পারতেন তাহলে এ অবস্থা হতো না। দীনের খাদেমগণ রাসূলের জীবন থেকে যতটুকু পালন করে, জনগণ ততটুকুকেই পূর্ণ ইসলাম মনে করে। আলেমগণই দীনের ব্যাপারে নবীর ওয়ারিস বা উত্তরাধিকারী। সাধারণ মুসলমানগণ তাদের কাছ থেকেই দীনের ধারণা ও শিক্ষা পেয়ে থাকেন। তাই আলেমগণই প্রকৃতপক্ষে ইসলামের ধারক ও বাহক। আজ মুসলিম সমাজে ইসলামের সঠিক মর্যাদা বহাল করার দায়িত্ব তাঁদেরই। তাঁরা যদি রাসূলের গোটা জীবনকে আদর্শ হিসাবে গ্রহণ করে যাবতীয় বাতিল মতবাদ ও চিন্তাধারার বিরুদ্ধে ইসলামকে বিজয়ী করার আন্দোলনে সক্রিয় হন তাহলে এ দেশে দীন ইসলাম কায়েম হওয়া অত্যন্ত সহজ। কোটি কোটি মুসলিম জনতা তাঁদের নেতৃত্বে অকাতরে জীবন বিলিয়ে দেবে।

www.bjilibrary.com

কিন্তু দুর্ভাগ্যের বিষয় যে, ইকামাতে দীনের মহান ও প্রধান দায়িত্বের প্রতি যথার্থ মনোযোগ না দিয়ে ইসলামের বহু ছোটখাটো বিষয় নিয়ে বিভিন্ন মত ও পথে জনগণকে পরিচালিত করার ফলে সাধারণ মানুষ বিভ্রান্ত হয়ে ইসলাম বিরোধী শক্তির সহজ শিকারে পরিণত হচ্ছে। আসুন, আমরা সবাই নবীর জীবন থেকে আদর্শ গ্রহণ করে তাঁরই শেখানো নিয়মে ইসলামী আন্দোলন করি এবং অপ্রয়োজনীয় ধর্মীয় মতবিরোধ ত্যাগ করে ঐক্যবদ্ধভাবে কালেমায়ে তাইয়েবার ঝাণ্ডা নিয়ে ময়দানে ঝাঁপিয়ে পড়ি।

সর্বশেষে আরও একটা প্রশ্ন বড় হয়ে দেখা দেয়। আলেম সমাজ কুরআন-হাদীসের ভিত্তিতেই দীনের খেদমত করা সত্ত্বেও রাসূলের মর্যাদা মুসলিম সমাজে সঠিকভাবে বহাল নেই কেন? রাসূলকে যে পজিশন আল্লাহ পাক দিয়েছেন, তা থেকে তাঁকে বাড়িয়ে আরও বড় করা হলে বা তা থেকে তাঁকে নীচে নামিয়ে আনা হলে রাসূলের মর্যাদা নষ্ট হয়। রাসূলকে আল্লাহর নির্ধারিত স্থানে বহাল রাখলেই তাঁকে প্রকৃত মর্যাদা দেওয়া হয়। এ মর্যাদাকে যারা বাড়াবার চেষ্টা করে বা কমাবার ব্যবস্থা করে তারাই দীনকে নষ্ট করে। এ দু'কারণেই উম্মতের মধ্যে দীনের ব্যাপারে অধঃপতন আসে।

প্রথম কারণটি হলো, নবীকে অতিমানব মনে করে অতি ভক্তি দেখানো। আল্লাহ তাঁকে স্বাভাবিক মানুষ বানিয়েছেন। কিন্তু এক শ্রেণীর লোক এমনকি এক শ্রেণীর আলেম পর্যন্ত রাসূলের মধ্যে এমন কতক গুণ আছে বলে বিশ্বাস করেন, যা শুধু আল্লাহর মধ্যেই থাকা উচিত। যেমন সব জায়গায় সব সময় রাসূলের রূহ হাযির থাকা। এ বিশ্বাসের কারণেই মীলাদ মাহফিলে রাসূল (স) হাযির আছেন মনে করে দাঁড়িয়ে তাঁকে সম্মান করা হয়। এ বিশ্বাস ছাড়া যদি কেউ দাঁড়ায় তাহলে অবশ্য আলাদা কথা। কিন্তু এ বিশ্বাস থাকলে তা শিরকের পর্যায়েই পড়ে। আল্লাহকে ডাকলে যেমন সব সময় শুনতে পান, রাসূলও শুনতে পান মনে করে ইয়া রাসূলাল্লাহ বা ইয়া নবী বলে সম্বোধন করা হয়। রাসূলের প্রতি সালাম পাঠালে ফেরেশ্‌তাগণ তা রাসূলের নিকট পৌঁছিয়ে দেন বলে হাদীসে আছে। কিন্তু যে কোন স্থান থেকে সালাম দিলে তিনি নিজে তা শুনতে পান বলে বিশ্বাস করা শিরক। আল্লাহ্ সব কিছু শুনেন ও দেখেন—তিনি 'সামী' ও 'বাসীর'। এ গুণ শুধু আল্লাহ্‌র। রাসূলের মধ্যে এ গুণ আছে মনে করা শিরক। এভাবে রাসূলের মধ্যে এমন সব গুণ আরোপ করা হয় যা দ্বারা তাঁকে মানুষের মর্যাদা থেকে বাড়িয়ে মুসলিম সমাজে ফিৎনা ও বিশৃঙ্খলা সৃষ্টি করা হয়। কুরআন হাদীসে এ ধরনের বিশ্বাসের কোন প্রমাণ নেই। এটা কত বড় ধৃষ্টতা যে, এসব কথা যারা বিশ্বাস করেন না, তাদেরকে কাফের বলে গালি পর্যন্ত দেওয়া হয়। দীনের বুনিয়াদি শিক্ষা ও ইসলামী চরিত্র গঠনের কাজ বাদ দিয়ে এ জাতীয় লোকেরা রাসূলের মহব্বতের দোহাই দিয়ে মুসলিম সমাজে জঘন্য বিভেদ সৃষ্টি করে। রাসূলকে অতি মানব বানিয়ে যে মহব্বতের দাবি করা হয়, সে জাতীয় মহব্বতের বাড়াবাড়িই খ্রিস্টান ও ইয়াহুদীদের মধ্যে দেখা যায়। খ্রিস্টানরা হযরত ঈসা (আ)-কে এবং ইয়াহুদীরা হযরত ওযায়র (আ)-কে মানুষের মর্যাদা থেকে বাড়িয়ে আল্লাহর ছেলে বলে বিশ্বাস করে আল্লাহর দীনকে বিকৃত ও বিনষ্ট করেছে।

www.bjilibrary.com

রাসূলের মর্যাদা বিনষ্ট হওয়ার দ্বিতীয় কারণটি হলো, রাসূলকে আল্লাহর দেওয়া পজিশন থেকে ছোট করে ফেলা। আল্লাহ পাক রাসূলকে উসওয়ায়ে হাসানা বা শ্রেষ্ঠতম আদর্শ বলে ঘোষণা করেছেন। কিন্তু দু'ভাবে তাঁর এ মর্যাদা নষ্ট করা হচ্ছে। আল্লাহ তাঁকে জীবনের সব ক্ষেত্রে আদর্শ বানিয়েছেন। কিন্তু তাঁকে শুধু ধর্মীয় ক্ষেত্রে আদর্শ মনে করা হয়। আর সমাজ, রাজনীতি ও অর্থনীতির বেলায় রাসূলকে অনুসরণ করা দীনের দায়িত্বই মনে করা হয় না। তেমনিভাবে আল্লাহ পাক একমাত্র রাসূলকেই আদর্শ হিসেবে গ্রহণ করার হুকুম করেছেন। অথচ রাসূল ছাড়া বহু বুযুর্গ ও দীনি ব্যক্তিকে আদর্শ মনে করা হয়।

রাসূলকে সব বিষয়ে আদর্শ নেতা মনে করা এবং আর কাউকে তেমন মনে না করাই হলো আল্লাহ পাকের নির্দেশ। যারা শুধু ধার্মিক হয়েই সন্তুষ্ট এবং বাস্তব জীবনের সব ক্ষেত্রে রাসূলের অনুসরণ করার গুরুত্ব বুঝে না, তারা যেমন রাসূলকে সঠিক মর্যাদা দেয় না, তেমনি যারা অনেক লোককে আদর্শ মানে তারাও আল্লাহর রাসূলকে ছোট করে ফেলে। তারা অন্য লোককে রাসূলের সমান মর্যাদা দিয়ে বসে। তাই দীন ইসলামকে সত্যিকারভাবে অনুসরণ করতে হলে রাসূলকে সঠিক মর্যাদায় বহাল রাখতে হবে।

ধর্মের নামে এক শ্রেণীর লোক হযরত আবদুল কাদের জিলানী (র) ও হযরত মুঈনুদ্দীন চিশতী (র)-কে রাসূলুল্লাহ (স) থেকেও বড় মর্যাদা দিয়ে বসে। এসব অলীদের মাজারে যেয়ে হাজার হাজার মানুষ তাদের কাছে সন্তান, চাকরি ও দুনিয়ার বহু কিছু চায়। অথচ এসব দেবার ক্ষমতা রাসূলেরও নেই। আল্লাহ ছাড়া আর কোন সত্তার নিকট এ সবের জন্য দোয়া করা শির্কী কাজ। এ কাজ করা দ্বারা তারা রাসূলের একান্ত অনুসারী ও ভক্ত এ দু'জন বুযুর্গকে রাসূলের চেয়ে বড় মর্যাদা দেয়। এ সব লোক কাবা শরীফ, মদীনার মসজিদ ও রাসূলের মাযার যিয়ারত করতে না যেয়ে ঘটা করে বাগদাদ ও আজমীর শরীফ যিয়ারতে যায়। এদের নিকট রাসূলের মর্যাদা মোটেই স্পষ্ট নয়।

সীরাতুন্নবীর আলোচনা তখনই সার্থক হবে যখন আমরা মুহাম্মাদুর রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লামকে ঐ মর্যাদার আসনে বহাল করব, যে মর্যাদা স্বয়ং আল্লাহ পাক তাঁকে দিয়েছেন। তিনি মানুষ হিসেবে শ্রেষ্ঠ মানুষ, জীবনের সব ক্ষেত্রে তিনি শ্রেষ্ঠতম আদর্শ এবং তাঁর উম্মতের মধ্যে কেউ এ মানের আদর্শ নন। এ তিনটি কথা ভালভাবে বুঝে তাকে অনুরসণের চেষ্টা করলে ইসলামের সঠিক পথ সহজেই পাওয়া যায়। তাই এ কথা স্বীকার না করে উপায় নেই যে, রাসূল (স)-ই দীন ইসলামের মূল ভিত্তি–দ্বীনের আসল রূপ ও জীবন্ত নমুনা। আল্লাহ আমাদের সবাইকে তৌফিক দিন যাতে বাস্তব জীবনে আমরা রাসূল (স)-এর সঠিক মর্যাদা রক্ষা করে চলতে পারি। আমীন!

www.bjilibrary.com

নবী জীবনের আদর্শ

মানব জীবনে আদর্শের প্রয়োজনীয়তা

যা অনুকরণ ও অনুসরণের উপযোগী তাই আদর্শ। ইংরেজি 'মডেল' শব্দ দ্বারা যে ভাব প্রকাশ করা যায়, আদর্শ শব্দে পূর্ণভাবে সেই ভাব প্রকাশ পায়। মানুষের জীবনের সব অবস্থায় এবং সব মানুষের জীবনেই আদর্শের প্রয়োজন। আদর্শ বই দেখে যেমন শিশু সুন্দর করে লিখতে শিখে, তেমনি মানুষকে সবদিক দিয়ে উত্তম কোন মানুষকে অনুকরণ করে উন্নত হতে হয়। মানুষ স্বভাবত কোন অনিশ্চিত অবস্থার দিকে অগ্রসর হতে পছন্দ করে না বলেই তার রুচি অনুযায়ী অন্য কোন যোগ্য মানুষকে আদর্শ হিসেবে বেছে নেয় এবং তার আদর্শকে অনুসরণ করে অগ্রসর হয়।

বুঝে শুনে হোক বা না বুঝেই হোক, মানুষ কোন না কোন মানুষকে আদর্শ হিসেবে গ্রহণ করতে বাধ্য হয়। কেননা মানুষ মাত্রেরই জীবনে বড় হবার আকাঙ্ক্ষা থাকে। এই আকাঙ্ক্ষাকে কেন্দ্র করে একটা কাল্পনিক আদর্শ তার মনে দানা বাঁধে। কিন্তু বাস্তব জীবনে শুধু একটা কাল্পনিক আদর্শই মানুষের ভিতর কাজের উৎসাহ সৃষ্টি করতে পারে না। তাই ঐ আদর্শের ভিত্তিতে অতীত বা বর্তমানের কোন বাস্তব মানুষকে উদাহরণ হিসেবে গ্রহণ করতে হয়।

একজন তরুণ দার্শনিক তার দৃষ্টিতে আদর্শস্থানীয় দার্শনিককে 'মডেল' হিসেবে গ্রহণ করে। একজন উদীয়মান রাজনীতিক কোন প্রতিষ্ঠিত নামকরা রাজনৈতিক নেতাকেই আদর্শ হিসেবে গ্রহণ করে তার মত বড় হবার সাধনা করতে থাকে। অধ্যাপক, শিক্ষক, কবি, সাহিত্যিক, ডাক্তার, এডভোকেট, ব্যবসায়ী সকলের জীবনেই বড় হবার পথে আদর্শ মানুষ তালাশ করার প্রয়োজন হয়।

শৈশবকাল থেকেই মানুষ অপর মানুষকে অনুকরণ করে বাঁচতে শিখেছে। শুধু খাওয়া-পরা, হাঁটা-চলা, কথা বলাই নয়—এই শিক্ষা পদ্ধতি তার সমগ্র জীবনে পরিব্যাপ্ত হয়ে আছে। এই স্বাভাবিক শিক্ষানীতিই মানুষের জীবনে আদর্শের আবশ্যকতা সৃষ্টি করে।

আদর্শের সন্ধানে প্রধান সমস্যা

মানব-জীবনে আদর্শের অপরিহার্যতা স্বীকার করে নেবার পর প্রয়োজন দেখা দেয় অনুকরণযোগ্য 'আদর্শ মানুষের' সন্ধান করা। আর এখানেই বিরাট সমস্যা দেখা দেয়। কারণ এ সমস্যার সমাধান অত্যন্ত কঠিন। কেননা কোন কালে এবং কোন দেশেই এমন একজন লোক পাওয়া যায় না, যাকে সকল দিক দিয়েই অনুকরণযোগ্য বলে মেনে নেওয়া চলে। আদর্শ দার্শনিক ব্যক্তি বাস্তব জীবনে আদর্শ না-ও হতে পারে। আদর্শ রাজনীতিক বলে যাকে অনুকরণ করা শুরু হল, পারিবারিক জীবনে তাকে ঘৃণ্য বলেও মনে হতে পারে। আদর্শ সাহিত্যিক বলে পরিচিত লোকটির ব্যক্তিগত জীবন পঙ্কিলও হতে পারে। এডভোকেট হিসেবে যাকে আদর্শ মনে হয়, তার রাজনৈতিক জীবন কলঙ্কময় হতে পারে।

www.bjilibrary.com

এমতাবস্থায় যাকে একদিক দিয়ে আদর্শ মনে করা হলো তার জীবনের অন্যান্য দিকের জন্য তাকে ঘৃণা করতে হয়। ফলে তা বিরাট একটা মানসিক সমস্যার সৃষ্টি করে। এই মানসিক সমস্যা বা দ্বন্দ্ব সৃষ্টি হলে তাকে অনুকরণ করা সম্ভব হয় না। ফলে তাকে অনুকরণযোগ্য বলে স্বীকার করে নিলে মনের অগোচরেই তাকে অন্যান্য ক্ষেত্রেও অনুকরণ করা হতে থাকে। তখন উক্ত 'আদর্শ' ব্যক্তির জীবনে যে সব ঘৃণ্য বিষয় বর্তমান থাকে সেগুলিকেও কোন প্রকারে ভাল বলে ব্যাখ্যা করার চেষ্টা চলে। এ কারণেই এবং এভাবেই অকল্যাণকর অনেক কিছুই হিতকর হিসেবে চিত্রিত হয় এবং সেগুলিকে সমাজে চালানোর প্রচেষ্টা চলে।

কাউকে একবার আদর্শ বলে গ্রহণ করলে প্রায় সবক্ষেত্রেই তাকে অন্ধভাবে অনুকরণ করা শুরু হয়ে যায়। তখন এই আদর্শ ব্যক্তিকে কেন্দ্র করেই ভাল ও মন্দের ধারণা সৃষ্টি হয়। এ কারণেই অনুকরণকারী তার নির্বাচিত আদর্শ ব্যক্তির দোষ-ত্রুটি সত্য হলেও তা দোষ বলে স্বীকার করতে চায় না। ফলে অনুকরণকারীর পক্ষে পুরোপুরি আদর্শের অনুসরণ করা সম্ভব হয়ে ওঠে না। সুতরাং যদি এমন কোন ব্যক্তির সন্ধান পাওয়া যায় যিনি জীবনের সব দিক ও বিভাগে অনুকরণ যোগ্য, তাহলে তাকে আদর্শ হিসেবে গ্রহণ করলে আর কোন সমস্যা থাকে না। কিন্তু এমন একজন আদর্শ ব্যক্তির সন্ধান পাওয়াই মানুষের জন্য সর্বাপেক্ষা কঠিন সমস্যা।

মানব জীবন

জীবনের সকল স্তরে এবং সকল দিকে এক ব্যক্তিকে আদর্শ হিসেবে পাওয়া একটা বিরাট সমস্যা। মানব জীবনের ব্যাপকতা অনুধাবন করতে পারলে এ সমস্যার গভীরতা বিরাটত্ব সহজে অনুধাবন করা যাবে।

প্রথমত, একজন ব্যক্তির জীবনে শৈশব থেকে আরম্ভ করে বার্ধক্য পর্যন্ত অনেকগুলো স্তর রয়েছে। এর প্রতিটি স্তরেই তার জন্যে আদর্শের প্রয়োজন। এমন কোন মানুষ পাওয়া যাবে না, যাকে বাল্যকাল থেকে বার্ধক্য পর্যন্ত সকল স্তরেই আদর্শ বলে স্বীকার করা যায়। তারপর একজন মানুষের জীবনে কাম, ক্রোধ, লোভ, মোহ, স্নেহ, ভালোবাসা, আবেগ ও ভাবপ্রবণতা মিলে এমন এক জটিল অবস্থার সৃষ্টি হয় যে, তাকে জীবনের প্রতিটি ব্যাপারেই আদর্শস্থানীয় হিসেবে মেনে নেওয়া কিছুতেই সম্ভব হয় না।

দ্বিতীয়ত, পারিবারিক জীবনে একজন মানুষকে বহুলোকের সাথে সম্পর্ক রক্ষা করে চলতে হয়। একই ব্যক্তি স্বামী, পুত্র, চাচা, ভাতিজা, ভাই, মামা, ভাগনে, ফুফা, খালু, শ্বশুর, জামাতা ইত্যাদি প্রকারের সম্পর্কে জড়িত এবং তাকে সেই অনুযায়ী প্রতিটি ক্ষেত্রে ভিন্ন ভিন্ন ভূমিকা ও দায়িত্ব পালন করতে হয়। ফলে এমন কোন মানুষ পাওয়া অসম্ভব হয়ে পড়ে যিনি এর প্রতিটি ক্ষেত্রেই তার সমগ্র জীবনে আদর্শ হিসেবে পরিগণিত হতে পারেন।

তৃতীয়ত, সমাজ জীবনের ক্ষুদ্রতম এলাকা, পাড়া বা মহল্লার প্রতিবেশীদের সাথেও সঠিক সম্পর্ক রক্ষা করে চলতে হয়। সৎ প্রতিবেশীর সাথে হয়তবা ভাল সম্পর্ক বজায় রাখা সম্ভব হয়। কিন্তু শত্রু-মিত্র, সৎ-অসৎ, নির্বিশেষে সকল প্রতিবেশীর সাথে আদর্শ সম্পর্ক বজায় রাখা এবং তাদের প্রতি দায়িত্ব ও কর্তব্যের হক আদায় করা কি সম্ভব?

www.bjilibrary.com

চতুর্থত, সমাজ জীবনের বৃহত্তর ক্ষেত্রে অগণিত মানুষের সাথে বহুমুখী সম্পর্ক গড়ে উঠে। লেন-দেন, কেনা-বেচা, আইন রচনা, শাসন করা ও শাসন মেনে চলা, বিচার করা ও মেনে চলা, আইন জারী করা, আইন মেনে চলা ও অমান্য করা ইত্যাদি বিষয়ে সমগ্র জীবনে আদর্শস্থানীয় বলে কোন এক ব্যক্তির সন্ধান পাওয়া কি সম্ভব?

পঞ্চমত, কোন এক ব্যক্তি রাষ্ট্রীয় জীবনে, বিশেষ করে রাষ্ট্রীয় দায়িত্ব পালনে কোন এক দেশের পক্ষে আদর্শ হলেও দুনিয়ার সকল দেশের সাথে যুদ্ধ, সন্ধি, ব্যবসা-বাণিজ্য, ওয়াদা পালনে এবং আন্তর্জাতিক ক্ষেত্রে স্বীকৃত নীতি মেনে চলার ব্যাপারে আদর্শ বলে বিবেচিত হওয়া কিছুতেই সম্ভব নয়।

সর্বশেষে একই ব্যক্তির পক্ষে সমাজ জীবনের সকল ক্ষেত্রে আদর্শ স্থাপনের সুযোগ ও অবকাশ পাওয়া কি সম্ভব? আইনদাতা, শাসক, বিচারক, রাষ্ট্রনায়ক, সেনাপতি, ব্যবসায়ী, শিক্ষক, অর্থনীতিবিদ, দার্শনিক, সাহিত্যিক ইত্যাদি সকল দিকে আদর্শ হওয়া এক ব্যক্তির পক্ষে কি করে সম্ভব হতে পারে? কোন এক ব্যক্তির জীবনে এত বিভিন্ন ধরনের কর্মক্ষেত্রে কর্ম সম্পাদনের সুযোগ পাওয়াই অসম্ভব। তদুপরি একই ব্যক্তির ভিতর এত প্রকারের গুণাবলি ও ঝোঁক-প্রবণতা থাকাও অসম্ভব। সুতরাং মানব জীবনের ব্যাপক পরিধিতে আদর্শ হিসেবে গ্রহণ করার যোগ্য 'একজন মানুষ' পাওয়ার সমস্যাটি মানুষের কাছে কঠিনতম সমস্যা।

নবী জীবন এ সমস্যারই সমাধান

মানব জীবনের সকল স্তর, দিক ও বিভাগে একই ব্যক্তিকে আদর্শ হিসেবে গ্রহণ করতে না পারলে মানুষের জীবনে সুন্দর সামঞ্জস্য সৃষ্টি হতে পারে না—এ কথা যেমন সত্য নবী ব্যতীত আর কোন মানুষের পক্ষেই যে সেরূপ আদর্শস্থানীয় হওয়া সম্ভব হয় না সে কথাও তেমনি মহাসত্য। যে আল্লাহ মানুষের জীবনে আদর্শের সন্ধান ও তার অনুসরণ অপরিহার্য করে দিয়েছেন তিনিই তা তালাশ করার সুবিধার জন্যে মানুষের মধ্যে নবী ও রাসূল পাঠাবার ব্যবস্থা করেছেন।

কোন মানুষই নিজেকে নির্ভুল বলে দাবি করতে পারে না। জন্ম থেকে মৃত্যু পর্যন্ত কোন ভুল-ভ্রান্তি তাকে স্পর্শ করতে পারেনি, একথা বলার সাহস কারও থাকতে পারে না। কেউ তা দাবি করলে তা সত্যের অপলাপ মাত্র। কিন্তু নবী ও রাসূলগণ এ ক্ষেত্রে ব্যতিক্রম। তাঁদেরকে আল্লাহ তাআলাই নির্ভুল পথে পরিচালিত করেন। যে আল্লাহ অনন্ত অসীম নির্ভুল জ্ঞানের অধিকারী তিনিই ওহীর মাধ্যমে নবী রাসূলদেরকে নির্দেশ পাঠান। তাই তাঁদের গোটা জীবনই সঠিকভাবে পরিচালিত হয়।

এখানে উল্লেখ করা প্রয়োজন যে, নবী ও রাসূলগণ জন্ম থেকেই নবী। আল্লাহ পাক স্বয়ং তাঁদেরকে পরিচালিত করেন। যদিও ওহী নাযিল হওয়ার পূর্বে তাঁরা নিজেদেরকে নবী বলে জানতে পারেন না, তথাপি নবীসুলভ চরিত্র দ্বারা সকল সময়ই তাঁরা ভূষিত থাকেন। তাই একমাত্র নবীই সকল অবস্থায় মানুষের জন্য আদর্শ।

www.bjilibrary.com

শেষ নবীই একমাত্র অনুসরণযোগ্য আদর্শ

সকল নবীই নির্ভুল জীবনের অধিকারী। তাঁরা আল্লাহর ওহী দ্বারা পরিচালিত। এ কারণে তাঁরা সকলেই মানুষের জন্যে অনুসরণযোগ্য আদর্শ। কিন্তু এখন শেষ নবী হযরত মুহাম্মদ (স)-ই একমাত্র বাস্তব আদর্শ হিসেবে অনুসরণযোগ্য। কারণ তাঁর পূর্বের রাসূলদের নিকট আল্লাহর প্রেরিত অহীর জ্ঞান আজ আর নির্ভুল ও অবিকৃত অবস্থায় বর্তমান নেই। তাঁদের নিকট প্রেরিত কিতাব মূল ভাষায় উদ্ধার করার উপায় নেই এবং তাঁদের জীবন যাপন প্রণালী (সুন্নাত) সম্পর্কে সঠিক জ্ঞান লাভ করারও কোন পথ নেই। তা সত্ত্বেও তাঁরা সকলেই আদর্শস্থানীয় মানুষ।

শেষ নবী হযরত মুহাম্মদ (স) নবীগণের শ্রেষ্ঠ। সকল নবীর আদর্শই তাঁর জীবনে পূর্ণতা পেয়েছে। তাঁর নিকট প্রেরিত আল্লাহর বাণী আল কুরআন পূর্ববর্তী সকল অহীর পূর্ণরূপ। আল্লাহ পাক আর কোন নবী পাঠাবেন না। তাই কুরআনকে অবিকৃত অবস্থায় হেফাযত করার দায়িত্ব তিনি নিজেই নিয়েছেন। তিনি বলেন ঃ إِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا الذِّكْرَ وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُوْنَ

"নিশ্চয় এই কুরআন আমিই নাযিল করেছি এবং নিশ্চয় আমিই এর হেফাযতকারী।" (আল হিজর ঃ ৯)

আল্লাহ পাক যেমন কুরআনকে হেফাযত করেছেন তেমনি তার নবীর সমগ্র জীবনের ইতিহাস মানব জাতির জন্যে বাঁচিয়ে রেখেছেন। তাঁরই জীবনে প্রতিফলিত হয়েছে কুরআনের বাস্তব রূপ—যা মানব জাতির জন্যে সর্বোত্তম আদর্শ। বিশ্বের আর কোন মানুষের সমগ্র জীবনের বিভিন্ন দিক ও বিভাগ সম্পর্কে এত বিস্তারিত জানার কোন উপায় নেই। বিপুল হাদীস-বিদ্যার সংকলন, তার সত্য-মিথ্যা যাচাই-বাছাই ও গবেষণার মাধ্যমে শেষ নবীর বাস্তব জীবনকে সঠিকরূপে জানার ও অনুসরণ করার যে ব্যবস্থা আল্লাহ করে রেখেছেন তার নজীর আর কোন মহামানবের বেলায় দেখা যায় না। মুহাদ্দিস অভিধায় পরিচিত একদল অতি উন্নত চরিত্রবান মানুষ কর্তৃক শেষ নবীর সমগ্র জীবন সম্পর্কে সকল তথ্য সংগ্রহ ও সংরক্ষিত হয়েছে। তারা ছিলেন অতি তীক্ষ্ণ স্মরণশক্তির অধিকারী এবং পুঙ্খানুপুঙ্খরূপে সত্যের সন্ধানকারী। তারা ভক্তির আতিশয্যে নবীর জীবন সম্পর্কে কোন অতিরঞ্জিত কথা বা অসত্য বিষয়কে গ্রহণ করতে রাযী হননি।

সুতরাং একমাত্র মুহাম্মদ (স)-কে আদর্শ হিসেবে গ্রহণ করলেই সকল নবীকে অনুসরণ করা হবে। অন্যান্য প্রেরিত কিতাবের হেদায়াত যেমন কুরআনের মাধ্যমেই পাওয়া সম্ভব, তেমনি যে কোন নবীর আদর্শের অনুসরণ করা সম্ভব একমাত্র শেষ নবীর অনুসরণের মাধ্যমে। তাই আল্লাহ পাক স্পষ্ট ভাষায় ঘোষণা করেছেন ঃ

لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِىْ رَسُوْلِ اللّٰهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ ـ

"আল্লাহর রাসূল (মুহাম্মদ) (স)-এর মধ্যেই তোমাদের জন্যে সুন্দর আদর্শ রয়েছে।" (আহযাব ঃ ২১)

আদর্শ কখনও অসুন্দর হতে পারে না। তা সত্ত্বেও আল্লাহ পাক 'সুন্দর আদর্শ' উল্লেখ

www.bjilibrary.com

করেছেন। কারণ মানুষ আদর্শ ব্যতীত চলতে অক্ষম বলে অসুন্দরকেও আদর্শ মনে করে বসে। তাই তিনি মানুষের জীবনে সর্বকালের জন্য একমাত্র হযরত মুহাম্মদ (স)-কেই সুন্দরতম আদর্শ হিসেবে নির্দেশ করেছেন।

নবী জীবনের বাস্তব আদর্শ

এখন শেষ নবী হযরত মুহাম্মদ (স) বাস্তব জীবনের বিভিন্ন স্তর ও অবস্থায় মানব জাতির জন্যে কিরূপ আদর্শ ছিলেন তার সংক্ষিপ্ত আলোচনা প্রয়োজন। অন্যান্য মহামানবের ন্যায় তাঁর জীবন থেকে কিছু সংখ্যক আদর্শ বেছে বের করা অর্থহীন। কারণ তাঁর গোটা জীবনটাই আদর্শ। তাঁর জীবনের প্রতিটি খুঁটিনাটি বিষয়ও আদর্শের মর্যাদা রাখে।

শৈশবে

নবী করীম (স) তাঁর শৈশবে যে সুন্দর চরিত্রের পরিচয় দিয়েছেন তা একজন আদর্শ শিশুরই উপযোগী। আমরা যদি নিজেদের পরিবারের তথা সমাজের ছেলেমেয়েদেরকে 'শিশু মুহাম্মদের' আদর্শে গড়ে তুলতে পারি তাহলে যে কোন ব্যক্তিই তাদেরকে আদর্শ বলে স্বীকার করবে। তাই তাঁর শৈশব জীবনের প্রতিটি ঘটনা মানব শিশুদের জন্য উৎকৃষ্টতম আদর্শ। ছোটদের উপযোগী করে লেখা নবীর জীবনী পাঠ করলে এ বিষয়ে বিস্তারিত বিবরণ ও ঘটনা জানার সুযোগ হবে।

কৈশোরে

আরবের অন্ধকার যুগের বর্বর সমাজের বালকদের মধ্যে 'বালক মুহাম্মদের' যে পরিচয় রয়েছে তা এতই স্পষ্ট, সুন্দর ও আকর্ষণীয় যে, এই এতিম বালকটির কিশোর বয়সের উজ্জ্বল ঘটনাবলি তাঁর সমবয়সীদের মনে গভীর ছাপ রেখেছিল। তাই তাঁর পরিণত বয়সেও বালক মুহাম্মদ (স) সম্পর্কে সঠিক তথ্য সংগ্রহ করতে বেগ পেতে হয়নি। পাড়া-প্রতিবেশীদের সাথে চলাফেরায়, মাঠে-ময়দানে রাখাল বালকদের সাথে মেষ চারণায় এবং প্রতিদিনের ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র আচার-ব্যবহারে বালক মুহাম্মদ মক্কার প্রশংসনীয় বালকদের নিকটও আশ্চর্য চরিত্রের অধিকারী বলে পরিচিত ছিলেন। কিশোর বয়সই ছেলেমেয়েদের চরিত্র গঠনের সবচেয়ে উপযোগী সময়। এ সময়েই তাদেরকে আদর্শের আলোকে গঠন করা একান্ত প্রয়োজন। যদি কিশোর মুহাম্মদের চরিত্র সত্যিই আদর্শ হয়—এবং নিঃসন্দেহে তাঁর চরিত্রই সর্বোত্তম আদর্শ তবে অন্য সব ধরনের আদর্শ ত্যাগ করে কিশোরদেরকে বালক মুহাম্মদ (স)-এর আদর্শে গড়ে তুলতে হবে। এজন্যে বিশেষ করে বাংলাদেশের বিদ্যালয়সমূহে বালক মুহাম্মদ (স)-এর চরিত্র শিক্ষা দেবার ব্যবস্থা গ্রহণ করতে হবে।

যৌবনে

সে সময় আরবের সমাজে সকল প্রকার চরিত্র ধ্বংসকারী রীতি ও ব্যবস্থা চালু ছিল। তা সহজেই যুবকদেরকে ভোগবাদী ও স্বার্থপর করে তুলতো। তা সত্ত্বেও 'যুবক মুহাম্মদ' পঁচিশ বছর বয়সে চল্লিশ বছরের প্রৌঢ়া খাদীজা (রা)-কে বিয়ে করে সমসাময়িক যুব সমাজে এক বিপ্লব সৃষ্টি করেন। তৎপূর্বে খাদীজা (রা)-এর বিরাট ব্যবসা সততা ও নিষ্ঠার সাথে পরিচালনা করে তিনি বিশ্ববাসীর সামনে আদর্শ স্থাপন করেন।

www.bjilibrary.com

সমগ্র মানব জাতির জন্যে সমাজ সংস্কারের যে শ্রেষ্ঠতম আদর্শ তিনি রেখে গেছেন, যুবক বয়সেই তিনি তাঁর সূচনা করেন। আবু বকর (রা) এবং সমবয়সী আর কিছু যুবককে নিয়ে তিনি 'আল্ হিলফুল ফুযূল' নামক একটি যুব সংগঠনে যোগদান করেন এবং বিভিন্ন সংস্কারমূলক ও সেবামূলক কাজ করে সমাজে সুনাম ও সুখ্যাতি অর্জন করেন। তৎকালে মক্কা ছিল আরবের কেন্দ্রস্থল। সেখানেই ছিল কাবা ঘর। তাই হজ্জের মৌসুমে দেশের সকল এলাকা থেকে লোক এসে মক্কায় ভিড় করতো। যুবক মুহাম্মদ তাঁর সমিতির বহুমুখী কাজের মাধ্যমে এসব লোকের সাথে পরিচিত হন। পরিচিত হলেন তিনি 'আল আমীন' নামে। সমাজের ছোট-খাটো ঝগড়া বিবাদের মীমাংসা, দুর্বলকে সবলের অত্যাচার থেকে রক্ষা করা, আমানত বিশ্বস্ততার সাথে রক্ষা করা, মারামারি হানাহানির প্রতিরোধ ইত্যাদি কার্যাবলির মাধ্যমে তিনি সকলের শ্রদ্ধার পাত্র হয়ে উঠেন। এতিম যুবক হয়েও তিনি মক্কার সমাজপতিদের নিকট মর্যাদার আসন লাভ করেন।

কাবা ঘরের দেওয়াল মেরামত কালে 'হাজরে আসওয়াদ' নামক বিখ্যাত কালো পাথরটি দেওয়ালে স্থাপন করার অধিকার নিয়ে মক্কার নেতাদের মধ্যে ঝগড়া বাধে। 'আল-হিল ফুল ফুযূল' সমিতির নেতা যুবক মুহাম্মদের উপর সেই ঝগড়া মীমাংসা করার দায়িত্ব দেওয়া হয়। একখানা চাদরের উপর 'আল আমীন' স্বয়ং পাথরটি উঠিয়ে দিলেন। অতঃপর বিবদমান নেতাদেরকে দিয়ে চাদরের চারপাশ ধরিয়ে দেওয়ালে উঠালেন। এভাবে নৈতিক দিক দিয়েও যুবক মুহাম্মদের নেতৃত্ব সমাজ নেতাদের উপর কায়েম হল। তাই নবুওয়াত পাওয়ার তৃতীয় বছরে তার দেশবাসীকে আল্লাহর নির্দেশ পৌছানোর জন্যে তিনি যখন ছাফা পাহাড়ের নিকট সকলকে একত্রিত হতে আহ্বান জানালেন, তখন আবু লাহাব ও আবু জেহেলের ন্যায় দোর্দণ্ড প্রতাপশালী নেতারাও এই এতিম যুবকের ডাকে সেখানে হাজির হবার প্রয়োজন অনুভব করেছিল।

স্থান-কাল নির্বিশেষে যুব সমাজের জন্য যুবক মুহাম্মদের মত কোন আদর্শ যুবকের সন্ধান ইতিহাসে খুঁজে আর একটিও পাওয়া যায় কি? আজ আমাদের নওজোয়ানরা যদি যুবক মুহাম্মদকে আদর্শ হিসেবে গ্রহণ করতে পারে তবে নিশ্চিতভাবে বিশ্বের সকল দেশের যুবকদের সামনে তারা আদর্শ হিসেবে প্রমাণিত হবে। পরিণতিতে শুধু আমাদের দেশে নয়, পবিত্রতার এক মহাবন্যায় বিশ্বের মানব সমাজের সকল আবিলতা ধুয়ে মুছে এক সুন্দর মানব জাতির সৃষ্টি হবে।

তৎকালীন আবর সমাজে নগ্নতা, অশ্লীলতা, বেহায়াপনা, নারী-পুরুষের অবাধ মেলামেশায় কলুষিত পরিবেশে 'যুবক মুহাম্মদ' চারিত্রিক পবিত্রতার এক মহান নজীর স্থাপন করেছিলেন। আজকে আমাদের দেশে পাশ্চাত্য সভ্যতার খোলসে নতুন করে পুনরাবির্ভূত সেই চরিত্র-বিধ্বংসী পরিবেশে তাঁর দৃষ্টান্ত থেকে যদি আমাদের যুব সমাজ প্রেরণা না নেয়, তবে প্রলয় সৃষ্টিকারী ক্ষতির হাত থেকে সমাজকে রক্ষা করার সকল প্রচেষ্টা ব্যর্থ হতে বাধ্য। যুব সমাজ যে গতিতে এই তথাকথিত প্রগতি ও আধুনিকতার অন্ধ অনুকরণে এগিয়ে চলেছে এবং জাতির পরিচালকের আসনে সমাসীন ব্যক্তিরা এর পরিপ্রেক্ষিতে যে ধরনের আচরণ করছেন তাতে এই ধ্বংস থেকে জাতিকে রক্ষা করার বলিষ্ঠ প্রতিরোধের দায়িত্ব ঐসব যুবকদের উপরই ন্যস্ত যারা মুহাম্মদ (স)-কে আদর্শ হিসেবে গ্রহণ করেছে।

www.bjilibrary.com

সমাজে যোগ্য নেতৃত্ব সৃষ্টির জন্যে 'যুবক মুহাম্মদ'(স) যে 'টেকনিক' বা পদ্ধতি অবলম্বন করেছিলেন চিরদিনই তা একমাত্র যুক্তিপূর্ণ এবং বিজ্ঞানসম্মত পদ্ধতি হিসেবে স্বীকৃত থাকবে। সমাজের সমস্যা নিয়ে যারা চিন্তা করেন এবং ক্ষুদ্র শক্তি নিয়ে তা সমাধানের কাজে নেমে পড়েন, তারাই সমস্যার প্রকৃত রূপ সম্পর্কে জ্ঞান লাভ করতে পারেন। এই ধরনের লোকের হাতে দেশ পরিচালনার দায়িত্ব অর্পিত হলেই কেবল জাতীয় সমস্যার সমাধান হতে পারে। সমাজ সেবক না হয়ে, সমাজের সমস্যার সাথে পরিচিত না হয়ে যারা সংক্ষিপ্ত (শর্টকাট) পথে রাজনৈতিক ক্ষমতা দখল করতে চান, তাদের দ্বারা সমস্যার সমাধান নয়, সমস্যার সৃষ্টিই শুধু সম্ভব। যুবক মুহাম্মদ জনসেবার মাধ্যমে সমাজের সমস্যাবলি সম্পর্কে যে বাস্তব জ্ঞান লাভ করেছিলেন তাতে পরিণত বয়সে আল্লাহর প্রেরিত সমাধানকে কার্যকরী করা তাঁর পক্ষে অত্যন্ত সহজ হয়েছিল। এইভাবে প্রথম থেকে সেবক হিসেবে তৈরি না হলে নেতৃত্বের গদি হঠাৎ করে কাউকে সেবাধর্মী করে গড়ে তুলতে পারে না।

পরিণত বয়সে

পরিণত বয়সে নবুওয়াত প্রাপ্তির পর হতে ইন্তিকাল পর্যন্ত হযরতের জীবনের প্রতিটি খুঁটিনাটি বিষয়ই মানুষের জন্যে আদর্শ। এরূপে আদর্শ শিশু, আদর্শ কিশোর, আদর্শ যুবক ও আদর্শ মানুষ হিসেবে হযরতের সমগ্র জীবনই মানব জীবনের সর্বস্তরে অনুসরণ ও অনুকরণের শ্রেষ্ঠতম নমুনা।

ব্যক্তিগত জীবনে

হযরতের ব্যক্তিগত জীবনে প্রতিটি খুঁটিনাটি ব্যাপারে যত কিছু অভ্যাস ছিল তা সবই এত সুন্দর যে সে বিষয়ে যতই চিন্তা করা যায় ততই তা অনুকরণযোগ্য বলে প্রমাণিত হয়। তাঁর চলা, বলা, উঠা-বসা, খাওয়া, শোয়া, মেলা-মেশা, হাসি-খুশি, রাগ-অনুরাগ, শাসন ও সোহাগ ইত্যাদি এবং স্বাস্থ্যবিধি ও ভদ্রতার দিক দিয়ে এতই আদর্শস্থানীয় যে, তাতে চিন্তাশীল মানুষ মাত্রই আকৃষ্ট হতে বাধ্য। তাঁর ব্যক্তিগত জীবনের প্রতিটি বিষয়ই যদিও মুসলমানদের উপর বাধ্যতামূলক করে দেওয়া হয়নি, তবু চিরদিন খোদাপ্রেমিক মানুষেরা তাঁকে সকল বিষয়েই অনুকরণ করতে চেষ্টা করেছেন।

আল্লাহর মনোনীত এই আদর্শ মানবকে মনেপ্রাণে ভালোবাসাতেই নিহিত রয়েছে আল্লাহর নৈকট্য লাভ ও তার প্রিয় হবার উপায়। তাই কুরআন মজিদে আল্লাহ পাক বলেছেন ঃ

قُلْ إِنْ كُنْتُمْ تُحِبُّوْنَ اللّٰهَ فَاتَّبِعُوْنِى يُحْبِبْكُمُ اللّٰهُ ـ

"(হে নবী! আপনি মুসলমানদেরকে) বলুন, আল্লাহকে ভালোবাসতে হলে আমাকে অনুসরণ কর, তা'হলে আল্লাহ তোমাদেরকে প্রিয় করে নেবেন।" (আলে ইমরান ঃ ৩১)

ঈমানের পরিণতিই আল্লাহর প্রতি গভীর ভালোবাসা। সে দুর্লভ ভালোবাসা লাভ করার সহজ উপায় নবীকে অনুসরণ করা। ভালোবাসা ব্যতীত অনুসরণ অসম্ভব। আর ভালোবাসা থাকলে অনুসরণ না করে থাকাই অসম্ভব। তাই ঈমানের সাধনা যারা করতে চায়, আল্লাহর

www.bjilibrary.com

ভালোবাসা যারা পেতে চায়, তাদেরকে রাসূল (স)-এর ব্যক্তিগত জীবনের সবকিছুই মহব্বতের সাথে গ্রহণ করতে হবে।

বিশেষ করে তিনি যা কিছু বলেছেন তা সবই আল্লাহর নির্দেশে বলেছেন। কুরআন এ বিষয়ে সার্টিফিকেট দিয়েছে ঃ وَمَا يَنْطِقُ عَنِ الْهَوٰى ـ اِنْ هُوَ اِلَّا وَحْىٌ يُّوْحٰى

"তিনি (নবী) নিজের প্রবৃত্তি হতে (কোন) কথা বলেন না, যা বলেন তা অহী ব্যতীত আর কিছুই নয়।" (আন্ নাজম ঃ ৩৪)

নবুওয়তের দায়িত্ব অর্পিত হবার পর তাঁর দীর্ঘ তেইশ বছরের ঘটনাবহুল জীবনে যে কয়টি কথা অহী নয়, তা হাদীস বিশারদগণ স্পষ্টভাবে বাছাই করে বের করেছেন। তদুপরি নবী জীবনের ব্যক্তিগত পছন্দ এবং অভ্যাসের যেসব বিষয় তাঁর উম্মতের অনুসরণ করার প্রয়োজন নেই, তাও ফিক্‌হশাস্ত্রবিদগণ নির্ধারণ করে দিয়েছেন। ঐগুলি ছাড়া হযরতের ব্যক্তিগত জীবনের অভ্যাসসমূহও যে তার উম্মতের জন্যে আদর্শ তা ঐ সম্পর্কিত অসংখ্য হাদীস থেকেও প্রমাণিত।

সমাজ জীবনে নবীর আদর্শ

ব্যক্তিগত জীবনের সকল স্তরে ও অবস্থায় মহানবী যেমন অতুলনীয় আদর্শ, তেমনি সমাজ জীবনের সকল দিক ও বিভাগে তিনিই বিশ্বমানবতার একমাত্র অনুসরণযোগ্য আদর্শ। মানুষ মাত্রই শান্তির কাঙাল। আর এজন্যে সমাজ জীবনে শান্তি স্থাপনের উদ্দেশ্যেই সভ্যতার এত উত্থান-পতন। শান্তির প্রচেষ্টাই মানব জাতির ইতিহাসকে বিচিত্র রূপ দান করেছে। তবু মানুষের শান্তি-সন্ধানের প্রচেষ্টার শেষ হচ্ছে না। মানুষ শান্তি খুঁজে পাচ্ছে না। যতই সভ্যতার উন্নতির দাবি করা হোক না কেন মানুষ শান্তির জন্যে বিভিন্ন আদর্শ ও পথ গ্রহণ করছে, আবার তা বর্জন করছে। এমনিভাবে মানুষ চিরদিন শান্তি-মরীচিকার পিছনে ছুটে চলেছে।

ষষ্ঠ শতাব্দীতে আরব ছিল অন্ধকারে নিমজ্জিত বিশ্বের নিকৃষ্টতম দেশ। কিন্তু সেই সমাজে মাত্র তেইশ বছরে মানব সভ্যতার সুন্দরতম সমাজ কায়েম করে গেলেন যে মহামানব তাঁর নিকট কোন্ আদর্শ ছিল? সেই আদর্শ খোঁজ করার প্রয়োজনীয়তা অনুভব করার উপরই আজ মানব জাতির শান্তি ও অস্তিত্ব নির্ভর করছে। চরম অশান্তি ও অসভ্যতার পঙ্কিলে নিমজ্জিত আরব জাতি যে নবীর আদর্শে অনুপ্রাণিত হয়ে মাত্র অর্ধ শতাব্দীর মধ্যে বিশ্বে শান্তি ও সভ্যতার উস্তাদে পরিণত হল, সে বিশ্বনবীর আদর্শকে সমাজের বিরাট ক্ষেত্রে বাস্তবে প্রয়োগ করতে হলে প্রথমেই সমাজ জীবনের জটিলতা সম্পর্কে স্পষ্ট ধারণা লাভ করা প্রয়োজন।

সমাজ জীবনের জটিলতা

মানুষে মানুষে পারস্পরিক সম্পর্কের সমষ্টির নামই সমাজ। এই সম্পর্ক যদি সুষ্ঠু ও সুনিয়ন্ত্রিত হয় তাহলেই সমাজ জীবন সুখের হয়। আর এর অভাবেই সমাজ জীবন দুর্বিষহ হয়ে উঠে। সমাজ জীবনের ক্ষুদ্রতম আকার হল পরিবার—যেখানে কমপক্ষে একজন

www.bjilibrary.com

পুরুষ ও একজন নারীর পারস্পরিক সম্বন্ধ প্রয়োজন হয়। সমাজের এই ক্ষুদ্রতম আকার থেকে শুরু করে বৃহত্তম মানব সমাজ পর্যন্ত ছোট বড় সকল সামাজিক প্রতিষ্ঠানেই সমাজের সদস্যদের একে অপরের সাথে সঠিক ও সুন্দর সম্পর্ক বজায় রাখা সর্বাপেক্ষা কঠিন সমস্যা।

পরিবারের বিভিন্ন সদস্যের সাথে পারস্পরিক মধুর সম্পর্ক না থাকলে তা হয়ে দাঁড়ায় একটা নিকৃষ্টতম কারাগার। কয়েকটি পরিবার মিলে যে পাড়া বা মহল্লার সৃষ্টি হয় তার সদস্যদের মধ্যে অর্থাৎ প্রতিবেশীর মধ্যে সুন্দর সম্পর্ক না থাকলে তা সকলের জন্য অশান্তির কারণ হয়। এইরূপ অনেক পাড়া মিলে যে এলাকা হয় সেখানে লেন-দেন, জমি-জমা, হাট-বাজার, ব্যবসা-বাণিজ্য, রাস্তা-ঘাট, যানবাহন, শিক্ষা-দীক্ষা, সামাজিক রীতি-নীতি, সভা-সমিতি, রুজি-রোজগার ইত্যাদির মাধ্যমে মানুষে মানুষে যে সম্পর্কের প্রয়োজন তা যদি সুবিচার ও সুসামঞ্জস্যপূর্ণ না হয়, তাহলে শান্তিপ্রিয় মানুষের পক্ষে মানব সমাজ ত্যাগ করে জঙ্গলে আশ্রয় নেওয়া ছাড়া উপায় থাকে না।

এই ধরনের অনেক এলাকা নিয়ে গঠিত হয় রাষ্ট্র। আধুনিককালে মানুষের সমাজ-জীবনে রাষ্ট্রই সর্বাপেক্ষা শক্তিশালী ও ব্যাপক সামাজিক প্রতিষ্ঠান। এখানে নাগরিকদের পারস্পরিক অধিকার ও কর্তব্য, সরকার ও জনগণের মধ্যে সম্বন্ধ, সরকারি ও বেসরকারি সংস্থার আপসের সম্পর্ক ইত্যাদি ইনসাফভিত্তিক না হলে, মানুষের জীবনে অশান্তির শেষ থাকে না। আবার যুদ্ধ, সন্ধি ও আন্তর্জাতিক বাণিজ্যের ব্যাপারে রাষ্ট্রে রাষ্ট্রে যদি ইনসাফের নীতি চালু না থাকে তবে মানুষ পশুর চেয়েও অধম জীবন যাপন করতে বাধ্য হয়।

পরিবার থেকে শুরু করে আন্তর্জাতিক ক্ষেত্র পর্যন্ত মানুষে মানুষে যে অগণিত সম্পর্ক রয়েছে তাকে শান্তিময় করার জন্যই আইন-কানুন, শাসন ও বিচার ব্যবস্থা চালু হয়েছে। একাধিক মানুষ যেখানেই মিলে-মিশে শান্তিতে থাকতে ইচ্ছা করবে সেখানে ব্যক্তি মানুষকে যার যার নিজ মর্জি, রুচি ও প্রবৃত্তি অনুযায়ী চলতে দিলে শান্তির পরিবর্তে অশান্তির রাজত্বই কায়েম হবে।

এজন্যেই মানুষের পারস্পরিক সম্পর্ককে সঠিকভাবে নিয়ন্ত্রিত করার জন্যে মানুষ আইন-কানুন তৈরির প্রয়োজনীয়তা অনুভব করে, সে আইন প্রয়োগ করে সকলকে শাসনাধীনে রাখার ব্যবস্থা করে, আইন অমান্যকারীদেরকে সমাজবিরোধী মনে করে এবং উপযুক্ত বিচার ব্যবস্থা কায়েম করে। এরূপ ক্ষুদ্রতম আকার হতে সমাজের বৃহত্তম আকার পর্যন্ত সর্বত্র আইন, শাসন ও বিচারের প্রয়োজন হয়।

নবীর সামাজিক শিক্ষা

এই জটিল সমাজ জীবনের বিভিন্ন স্তরে হযরত মুহাম্মদ (স) কিরূপ আদর্শ স্থাপন করে গেছেন তা সংক্ষেপে আলোচনা করতে গেলেও এক বড় গ্রন্থে পরিণত হবে। এখানে সে বিষয়ে সামান্য ইঙ্গিত দেওয়াই শুধু সম্ভব। হযরত সমাজ জীবনের দায়িত্ব কর্তব্যের বেড়াজাল থেকে নিরাপদ দূরত্বে অবস্থান করে আইন, শাসন ও বিচার সম্পর্কে সস্তা নছিহত খয়রাত করে এবং অবাস্তব উপদেশ দিয়ে সহজ বাহবা কুড়াতেন না। একটি নতুন জাতির পরিচালক ও নেতা হিসেবে তাঁকে আল্লাহর নিকট থেকে প্রাপ্ত আইন-কানুনকে

www.bjilibrary.com

বাস্তবে প্রয়োগ করতে হতো এবং এর আলোকে আরো অনেক আইন তৈরি করতে হতো। যে আইন তিনি সমাজে সকলের উপর প্রয়োগ করতেন, নিজেকে শুধু সেই আইনের অধীনে রাখতেন না, বরং সর্বপ্রথম তিনিই সেই আইন পালন করে দেখাতেন। আইন প্রয়োগ ও আইন অমান্যকারীকে শাস্তি দেওয়ার বেলায় ধনী, গরীব, আত্মীয়, অনাত্মীয়, মুসলিম, অমুসলিম নির্বিশেষে সকল মানুষকে এক আল্লাহর বান্দা হিসেবে সমান চোখে দেখতেন। পারিবারিক জীবন হতে আরম্ভ করে আন্তর্জাতিক ক্ষেত্র পর্যন্ত তিনি যে পূর্ণাঙ্গ ও সামঞ্জস্যপূর্ণ বিধান রেখে গেছেন এখানে তার কিছু নমুনা উল্লেখ করা হলো।

পরিবারে

বিশ্বনবীর 'পরিবার পরিকল্পনা' একটি পরিপূর্ণ বৈজ্ঞানিক ব্যবস্থা। এই পরিবার গঠন প্রক্রিয়ায় স্বামী-স্ত্রী, পিতা-মাতা, ভাই-বোন তথা যাবতীয় পারিবারিক সম্পর্কের জন্যে নবী করীম (স) পূর্ণাঙ্গ বিধান নিজের পরিবারে প্রয়োগ করে দেখিয়েছেন। পরিবারের আইনদাতা, শাসক ও বিচারক হিসেবে পরিবার পরিচালনার যে নমুনা তিনি রেখে গেছেন তা চিরকাল মানুষের কাছে বিস্ময় হয়ে থাকবে। পরিবার নামক প্রতিষ্ঠানের অন্যতম পরিচালিকা হিসেবে তিনি গৃহকর্ত্রীর যে মর্যাদা তাঁর স্ত্রীদেরকে দিয়েছেন তা নারীর মর্যাদার শ্রেষ্ঠ নিদর্শন। যে সমাজে পরিবারের কর্তারা স্ত্রীদের সাথে সদ্ব্যবহার করতে পারে না, তাদের পক্ষে কোন দায়িত্ব ইনসাফের সাথে পালন করাও অসম্ভব। তাই রাসূল (স) বলেছেন ঃ خِيَارُكُمْ خِيَارُكُمْ اِلٰى نِسَائِهِمْ

"তোমাদের মধ্যে তারাই ভাল, যারা তাদের স্ত্রীদের নিকট ভাল।"

অর্থাৎ কোন ব্যক্তির শরীফ হওয়া সম্পর্কে সঠিক সার্টিফিকেট দেওয়ার অধিকার রয়েছে তার স্ত্রীরই। অন্য মানুষের সাথে অভদ্র হওয়ায় বিপদের আশংকা আছে। কিন্তু স্ত্রীর প্রতি কঠোরতম অন্যায় করেও প্রাধান্য বজায় রাখার ক্ষমতা আছে বলে অবলা বিবির সাথে ভদ্র ব্যবহার করাই কঠিন। তদুপরি অন্যদের সাথে কিছুটা দূরে থেকে সম্পর্ক বজায় রাখা সম্ভব এবং সব সময়ও তাদের সাথে মেলা-মেশা করতে হয় না। কিন্তু স্ত্রীর সাথে ঘনিষ্ঠভাবে এবং সর্বদা মেলা-মেশা করতে হয় বলে স্বামীর কোন দুর্বলতা তার কাছে গোপন থাকে না। তাই স্ত্রীর নিকট হতে যে ব্যক্তি ভদ্রতার সার্টিফিকেট আদায় করতে পারে সে প্রকৃতই শরীফ ব্যক্তি। বিবাহ, তালাক, ফারায়েয (সম্পত্তি-বণ্টন) ইত্যাদি পারিবারিক গুরুত্বপূর্ণ বিষয়ে নবী করীম (স) যে আদর্শ প্রতিষ্ঠা করে গেছেন সভ্যতার দাবিদার সকল সমাজই তার শ্রেষ্ঠত্ব স্বীকার করতে বাধ্য। ইসলামের সামগ্রিক বিধানকে গ্রহণ না করার ফলে বিবাহ, তালাক, ফারায়েয সংক্রান্ত কিছু কিছু আইন বিভিন্ন অমুসলিম রাষ্ট্রে চালু করায় তারা উপযুক্ত ফল পাচ্ছে না। তবু এর দ্বারা তারা নবীর দেওয়া আদর্শ অনুকরণযোগ্য বলে স্বীকার করতে বাধ্য হচ্ছে।

হযরত এইরূপে মানব জাতির জন্যে আদর্শ স্বামী এবং আদর্শ পিতা। কিন্তু পরিবারের সকলকেই যেহেতু তিনিই পুত্র, কন্যা, মাতা, ভ্রাতা হওয়া শিক্ষা দিয়েছেন, সেহেতু আদর্শ পুত্র, আদর্শ কন্যা, আদর্শ মাতা, আদর্শ ভ্রাতার নমুনাও তাঁর নিকট হতেই পাওয়া যাবে।

www.bjilibrary.com

প্রতিবেশীতে

আদর্শ প্রতিবেশী হিসেবে হযরত যে আকর্ষণীয় জীবন যাপন করেছেন তা তাঁর প্রতিবেশী দুশমন বৃদ্ধাকেও মুগ্ধ করেছে। অসুস্থতার দরুন বৃদ্ধা যেদিন হযরতের পথে কাঁটা বিছাতে পারেনি সেদিন তিনিই অসুস্থ বৃদ্ধার সাথে সাক্ষাৎ করে প্রতিবেশীর হক আদায় করেছিলেন। প্রতিবেশীর শোকে সান্ত্বনা দেওয়া, বিপদে সাহায্য করা, সুখে সাহচার্য দান করা, রোগে সাক্ষাৎ ও মৃত্যুতে সৎকার করা প্রতিবেশীর হক বলে তিনিই দৃষ্টান্ত স্থাপন করেছেন। প্রতিবেশী পরামর্শ চাইলে সৎ পরামর্শ দান, কর্জ চাইলে দিতে অস্বীকার না করা, দিতে অক্ষম হলে সহানুভূতি প্রদর্শন, দৈনন্দিন ব্যবহার্য দ্রব্য ধার চাইলে ধার দেওয়া তিনি প্রতিবেশীর কর্তব্য হিসেবে নির্ধারিত করেছেন। এমনকি তিনি একথাও বলেছেন যে ঃ

لَيْسَ الْمُؤْمِنُ الَّذِىْ يَشْبَعُ وَجَارُهُ جَائِعٌ اِلٰى جَنْبِهِ ـ

"যে ব্যক্তি তার নিকটবর্তী প্রতিবেশীকে ভুখা রেখে নিজে পেট পুরে খায় সে মুমিন নয়।"

যদি প্রতিবেশীর মধ্যে এই অধিকার ও কর্তব্যের উপদেশ দিয়েই তিনি ক্ষান্ত থাকতেন; নিজে বাস্তবে পালন করে উদাহরণ পেশ না করতেন, তাহলে আরবের স্বার্থপর সমাজে তা কখনও বাস্তবে পরিণত হতো না। আমাদের সমাজ নেতাগণ যদি নিজেদের জীবনে নবীর এই শিক্ষাকে অনুসরণ করেন, তাহলে অল্প সময়ের মধ্যে সমাজের অবস্থা বদলে যাবে। প্রতিবেশীর অনাচার থেকে বাঁচতে পারলে মানুষ শান্তিতে আছে বলে মনে করে। তাই মহানবীর আদর্শ যদি কোন এলাকায় কায়েম হয় তাহলে সে এলাকায় অশান্তির কোন কারণই বাকী থাকবে না। এ প্রসঙ্গে তিনি আরও বলেছেন ঃ

وَاللّٰهِ لَايُؤْمِنُ وَاللّٰهِ لَايُؤْمِنُ وَاللّٰهِ لَايُؤْمِنُ الَّذِىْ لَايَامَنُ جَارُهُ بَوَائِقَهُ ـ

"আল্লার কছম (তিনবার) যার দৌরাত্ম্যে প্রতিবেশী শান্তি পায় না সে মুমিন নয়।"

রাষ্ট্রীয় জীবনে

আইন রচনা থেকে আরম্ভ করে তার প্রয়োগ ও বিচার ব্যবস্থা পর্যন্ত সকল ক্ষেত্রে মদীনাকে রাজধানী করে হযরত যে আদর্শকে বাস্তবে রূপদান করেছিলেন, মানবজাতি সে আদর্শকে কোন কালেই ম্লান করতে পারবে না। এ বিষয়ে হযরতের কায়েম করা 'রেকর্ড' ভঙ্গ করার সাধ্য কারও নেই।

রাষ্ট্রীয় জীবনে সুখ, শান্তি ও স্বাচ্ছন্দ্য প্রতিষ্ঠার জন্যে আধুনিক বিশ্বে ব্যাপক প্রচেষ্টা চলছে। কিন্তু তা শুধু অশান্তি বৃদ্ধি করেই চলেছে। এ পরিপ্রেক্ষিত মহানবীর রাষ্ট্রীয় আদর্শের আলোচনা করার গুরুত্ব অত্যন্ত বেশি। বিশেষ করে আমরা বাংলাদেশের অধিবাসীদের বিপুল সংখ্যাগরিষ্ঠ অংশ হযরতের আদর্শের অনুসারী বলে দাবি করি। আমরা এর বাস্তবায়নের দায়িত্ব অস্বীকার করতে পারি না। তাই প্রতিটি চিন্তাশীল ব্যক্তি বিশেষ করে রাষ্ট্র-নেতাদেরকে নবীর রাষ্ট্রীর আদর্শকে এ দেশে কায়েম করে মযলুম মানবতার সামনে দৃষ্টান্ত তুলে ধরতে এগিয়ে আসা উচিত।

www.bjilibrary.com

আদর্শ আইনদাতা, আদর্শ শাসক ও আদর্শ বিচারক হিসেবে দশটি বছর একটি রাষ্ট্র পরিচালনা করে মানব সভ্যতার ইতিহাসে তিনি যে বিপ্লব এনেছিলেন তা কোন দিক দিয়ে ত্রুটিপূর্ণ বলে প্রমাণ করার সাধ্য কারো নেই। তাই প্রকৃত কল্যাণব্রতী সরকার বলে দাবি করতে হলে এবং কল্যাণ আনতে হলে সে সরকারকে হযরতের আদর্শের পথ ধরে অগ্রসর হতে হবে।

নবী করীম (স) আল্লাহর প্রভুত্ব (সার্বভৌমত্ব) ও তাঁর একচ্ছত্র নেতৃত্বের ভিত্তিতে যখন রাষ্ট্র গঠনের প্রথম আওয়াজ তুললেন, তখন মক্কাবাসীগণ এ থেকে বিরত থাকার বিনিময়ে বাদশাহী করার অধিকার দেওয়ার প্রস্তাব করেছিল। আল্লাহর দেওয়া জ্ঞানে হযরত বুঝতে পেরেছিলেন যে, এভাবে ক্ষমতা দখল করে কোন সমাজেই আদর্শ কায়েম করা যায় না। তিনি যদি শাসক হওয়াকে চরম উদ্দেশ্য বলে গণ্য করতেন বা আল্লাহর অহী দ্বারা পরিচালিত না হতেন তবে মনে করতেন যে, ক্ষমতা দখল করে অর্ডিন্যান্স বলেই তিনি আল্লাহর সব ফরমান জারী করতে পারবেন। কিন্তু তিনি জানতেন যে, যাদের দ্বারা আইন প্রয়োগ করাতে হবে, যাদের মাধ্যমে বিচার ব্যবস্থা কায়েম করতে হবে, তারাই যদি নিজেদের জীবনে সে আইন পালন করতে রাযী না হয়, তবে তাদের দ্বারা কোন আদর্শই কায়েম হতে পারে না। তাই তিনি প্রথম তের বছর ধরে মক্কাকে কেন্দ্র করে আরবের বিভিন্ন স্থানের কিছু সংখ্যক লোককে আদর্শের আলোকে গঠন করলেন। আন্দোলনের এই ব্যক্তিগঠন স্তরে তিনি মানুষের মন-মগজে আল্লাহর সার্বভৌমত্ব, আল্লাহর ভালোবাসা ও ভয়, আখিরাতে পার্থিব জীবনের পুঙ্খানুপুঙ্খ বিচার এবং রাসূলের আনুগত্যের গুরুত্ব সম্পর্কে দৃঢ় বিশ্বাস সৃষ্টির চেষ্টা করেন।

কুরআন মাজীদের প্রথম তের বছরে অবতীর্ণ সূরাসমূহের অধিকাংশই এ ধরনের বিশ্বাসকে অন্তরে বদ্ধমূল করার জন্যে নাযিল হয়। আল্লাহ, রাসূল, আল্লাহর কিতাব ও আখিরাতের প্রতি ঈমানের ভিত্তিতে যে ধরনের চরিত্র সৃষ্টি হওয়া প্রয়োজন, নামায-রোযার মাধ্যমে তিনি কর্মীদের মধ্যে সেই সুনিয়ন্ত্রিত জীবন গঠন করতে থাকেন। এইরূপ ঈমান ও চরিত্র অন্যান্য মানুষের মধ্যে সৃষ্টি করার জন্যে তিনি প্রথম থেকেই তার কর্মীদেরকে নিয়োগ করেন। তারা যখন আল্লাহর সার্বভৌমত্ব ও রাসূলের নেতৃত্বে সমাজ গঠনের আওয়াজ তুললেন তখন তাদের উপর নেমে আসল অর্থনৈতিক, রাজনৈতিক, সামাজিক ও অন্যান্য সকল প্রকার কায়েমী স্বার্থের নির্যাতন। ফলে হযরতের আদর্শের সাথে তদানীন্তন সমাজের যে স্বাভাবিক লড়াই সৃষ্টি হয় তার মাধ্যমেই তিনি উপযোগী ব্যক্তি গঠনের সুযোগ পেলেন। কঠোর নির্যাতন ও ঈমানের অগ্নি পরীক্ষার ভিতর দিয়ে হযরতের কর্মীদল নিষ্ঠাবান খাঁটি আদর্শবাদী হিসেবে গড়ে উঠলেন।

তের বছরের কঠোর সাধনায় যে সব চরিত্র সৃষ্টি হল হিজরতের পর তাদের নেতৃত্ব প্রতিষ্ঠার সুযোগ পেয়েই হযরত সমাজ গঠনের কাজ শুরু করলেন। মাত্র দশ বছর আরবে তিনি তাঁর আদর্শের বাস্তব রূপদান করে মানব জাতির সামনে ইসলামী সমাজ ব্যবস্থার শ্রেষ্ঠত্ব প্রমাণ করলেন।

www.bjilibrary.com

কারো মনে যদি তাঁরই আদর্শ প্রতিষ্ঠার ইচ্ছা থাকে তাহলে তাকে হযরতের পরিকল্পনার আলোকে সমাজের পুনর্গঠন করতে হবে। আল্লাহর রাসূলের আদর্শ সম্বন্ধে যাদের সুস্পষ্ট জ্ঞান নেই, যাদের চরিত্রে সেই আদর্শের কোন পরিচয় নেই, তাদের দ্বারা কোনক্রমেই নবীর আদর্শে সমাজ গঠিত হতে পারে না। কোন দেশের সরকার যদি মহানবীর আদর্শে বিশ্বাসী হন এবং সেই আদর্শ কায়েম করতে আগ্রহান্বিত হন তাহলে নাগরিকদের মধ্যে ইসলামের উপযোগী ঈমান ও চরিত্র সৃষ্টির বাস্তব পদক্ষেপ গ্রহণ করতে হবে এবং ঈমান ও চরিত্রের ভিত্তিতে সরকারকে পুনর্গঠন করতে হবে। তা না হলে নবীর আদর্শের বিপরীত চিন্তা ও চরিত্রবিশিষ্ট ব্যক্তিদের মুখে আল্লাহ, রাসূল ও ইসলামের নাম লক্ষ-কোটি বার উচ্চারিত হলেও তাদের পক্ষে সে আদর্শ প্রতিষ্ঠা করা আদৌ সম্ভব হবে না।

যদি কেউ সত্যিই আইন রচনা হতে চায়, তাহলে হযরতকে অনুসরণ করা ছাড়া কোন উপায় নেই। আমেরিকা, ইংল্যান্ড বা রুশ, চীন হতে তা পাওয়া সম্ভব নয়। আদর্শ শাসক সৃষ্টি করতে চাইলে রাসূলের কাছে ফিরে যেতে হবে। বিচার ব্যবস্থাকে পূর্ণ ইনসাফভিত্তিক গড়তে হলে হযরতের নিকট থেকেই সবক নিতে হবে।

অর্থনৈতিক ক্ষেত্রে

মানুষের শারীরিক (বস্তুগত) অস্তিত্ব বজায় রাখার জন্যে যে সব জিনিসের প্রয়োজন তার উৎপাদন, বিনিময়, ব্যয় ও উদ্বৃত্তের ব্যবহার সম্পর্কে সমাজে সুষ্ঠু নিয়মনীতি না থাকলে মানব জীবন দুর্বিষহ হয়ে পড়ে। আল্লাহ পাক সমস্ত জীবের উপযোগী রিযিক সৃষ্টির দায়িত্ব গ্রহণ করেছেন। তিনি বলেন ঃ وَمَامِنْ دَابَّةٍ فِى الْاَرْضِ اِلَّا عَلَى اللّٰهِ رِزْقُهَا

"এমন কোন প্রাণী নেই যার রিযিকের দায়িত্ব আল্লাহর উপর ন্যস্ত নয়।" (হুদ ঃ ৬)

কিন্তু সমাজের পরিচালকগণ উৎপাদন ও বণ্টন ব্যবস্থাকে নিয়ন্ত্রণ করার জন্যে নিজেদের বুদ্ধিপ্রসূত যে সব নীতি গ্রহণ করেন তারই ফলে অর্থনৈতিক অসাম্য ও বিশৃঙ্খলার সৃষ্টি হয়। মহানবী আল্লাহর নির্ভুল জ্ঞানের ভিত্তিতে অর্থনীতির ক্ষেত্রে যে আদর্শ রেখে গেছেন তা যে কত সামঞ্জস্যপূর্ণ তা নিম্নের ইঙ্গিত থেকে স্পষ্ট হয়ে উঠবে।

উৎপাদনের ক্ষেত্রে তিনি সমস্ত হারাম বস্তুর উৎপাদন নিষিদ্ধ করে সমাজে অপবিত্রতার মূলেই কুঠারাঘাত করেছেন। উৎপাদনে শ্রমের মর্যাদাকে প্রতিষ্ঠিত করতে গিয়ে তিনি বলেন ঃ اَلْكَاسِبُ حَبِيْبُ اللّٰهِ "(আপন শ্রমে) উপার্জনকারী ব্যক্তি আল্লাহর বন্ধু।"

উৎপাদনে মজুরের অধিকার স্বীকার করে রাসূল (স) ঘোষণা করেন ঃ "যারা কাজ করে জীবিকা অর্জন করে, তারা তোমাদের ভাই। তোমরা যা খাও, তাদেরকেও তাই খেতে দাও, তোমরা যা পরিধান কর, তাদেরকেও তাই পরিধান করতে দাও।"

ব্যক্তিগত মালিকানার ব্যাপারে মানুষ চিরদিনই দুই চরম সীমায় অবস্থান করে চলেছে। ব্যক্তিগত মালিকানা এতই স্বাভাবিক যে, মানুষ কোন কালেই একে অস্বীকার করতে পারেনি। কিন্তু ব্যক্তি ও সমাজের প্রয়োজনে এই মালিকানাকে সঠিকরূপে নিয়ন্ত্রিত করার জন্যে আল্লাহ পাক যে বিধান দিয়েছেন, তা গ্রহণ না করে অর্থনীতির ক্ষেত্রে মানুষ দুই

www.bjilibrary.com

চরম অবস্থায় উপনীত হয়। ব্যক্তি স্বাধীনতার নামে অবাধ মালিকানা যেমন নিকৃষ্ট পুঁজিবাদের সৃষ্টি করে গোটা মানব সমাজকে গুটিকয়েক পুঁজিপতির অর্থনৈতিক গোলামে পরিণত করে, তেমনি সমাজের স্বার্থকে অত্যধিক গুরুত্ব দিতে গিয়ে 'সমাজতন্ত্র' ব্যক্তির সকল স্বাধীনতা কেড়ে নেয়। প্রথমটি রাজনৈতিক স্বাধীনতার দোহাই দিয়ে অর্থনৈতিক দাসত্বের সৃষ্টি করে আর দ্বিতীয়টি অর্থনৈতিক স্বাধীনতার নামে মানুষকে রাজনৈতিক দাসত্বে শৃঙ্খলিত করে এবং মানবাধিকারকে পদদলিত করে।

হযরত মুহাম্মদ (স) ব্যক্তি ও সমাজ উভয়কে উপযুক্ত ও ভারসাম্যপূর্ণ বিধান দিয়েছেন যা মানুষের রাজনৈতিক ও অর্থনৈতিক আযাদীকে সযত্নে রক্ষা করে। প্রথমত, ব্যক্তি যা কিছু উপার্জন করবে সেখানে বস্তু ও উপার্জনের উপায় সম্পর্কে বহু স্পষ্ট বাধা-নিষেধ আরোপ করা হয়েছে। দ্বিতীয়ত, হালাল বা বৈধ উপায়ে উপার্জিত সম্পদও তার যথেচ্ছা খরচ করার অধিকার নেই। এক্ষেত্রে অনেক বিধি-বিধান তাকে নিয়ন্ত্রিত করে। পিতা-মাতা, আত্মীয়-স্বজন, প্রতিবেশী, রাষ্ট্র ইত্যাদির হক আদায় করা অপরিহার্য করা হয়েছে। বিলাসিতাকে বহুলাংশে খর্ব করে দেওয়া হয়েছে। অপব্যয়কারীকে পবিত্র কুরআনে "শয়তানেরই ভাই" বলে অভিহিত করা হয়েছে। এরূপে নিয়ন্ত্রিত জীবন যাপন করার পর যে সম্পদ উদ্বৃত্ত থাকবে তার উপর প্রতি বছর যাকাত আদায় করা ফরয করা হয়েছে। ইসলামী রাষ্ট্রের পরিচালকদের প্রেরণায় সম্পদশালীরা সবসময়ই অক্ষম ব্যক্তিদের অর্থনৈতিক নিরাপত্তার জন্যে বায়তুল মালকে মজবুত করবে। এই আদর্শ রাসূলুল্লাহ (স) ও তাঁর খলিফাগণ স্পষ্টরূপে কায়েম করেছিলেন।

এর পরেও যদি কোন ব্যক্তির নিকট সম্পদ জমা হয়ে যায়, তবে তার মৃত্যুর সাথে সাথে তা আর কেন্দ্রীভূত থাকতে পারবে না। ব্যক্তিগত মালিকানা যাতে সমাজের স্বার্থকে নষ্ট করতে না পারে সে জন্য নবী (স) কুরআনের নির্দেশে 'ফারায়েয' ব্যবস্থা জারী করে গিয়েছেন। এর ফলে বহুলোকের মধ্যে সম্পদের বণ্টন বাধ্যতামূলক হয়ে পড়ে।

পুঁজিবাদের প্রধান বাহন হিসেবে যে দুটি ব্যবস্থা অর্থনৈতিক বিপর্যয় সৃষ্টি করে তা রাসূলের আদর্শে কঠোরভাবে নিষিদ্ধ। প্রথমত, সুদ ব্যবস্থা। ইসলাম এর বিরুদ্ধে কঠোর জিহাদ ঘোষণা করেছে। দ্বিতীয়ত, ব্যবসা বাণিজ্যের অবাধ স্বাধীনতা। এর ফলে কয়েকজন বড় ব্যবসায়ীর মুনাফাখোরী মনোবৃত্তি অগণিত ক্ষুদ্র ব্যবসায়ী ও ক্রেতার জীবন ধারণ অসম্ভব করে তোলে। মহানবী (স) বলেন ঃ

مَنِ احْتَكَرَ طَعَامًا اَرْبَعِيْنَ يَوْمًا ثُمَّ تَصَدَّقَ بِهِ لَمْ يَكُنْ لَهُ كَفَّارَةٌ ـ

"চল্লিশ দিন খাদ্যদ্রব্য গুদামজাত রাখার পর যদি কেউ তা (বিনামূল্যে) দান করেও দেয়, তবু এই অপরাধ ক্ষমা করা হবে না।"

ব্যবসা-বাণিজ্য সম্পর্কে রাসূল (স) এত বিধি-নিষেধ আরোপ করেছেন যে, তা কোন সমাজে কায়েম হলে বণ্টন ও বিনিময় সুষ্ঠু না হয়েই পারে না। অর্থনৈতিক ক্ষেত্রে মানুষ সবচেয়ে সহজে পথহারা হয়ে পড়ে। নবীর আদর্শ তাকে এখানে সরল ও সঠিক রাস্তায় পরিচালিত করে।

www.bjilibrary.com

আন্তর্জাতিক ক্ষেত্রে

রাষ্ট্রে রাষ্ট্রে যুদ্ধ বাধলে কোন্ নীতিতে যুদ্ধ পরিচালিত হওয়া উচিত সে সম্পর্কে মহানবী যে আদর্শ পালন করে গেছেন আধুনিক ও সভ্য নামে খ্যাত রাষ্ট্রসমূহও তা কল্পনা করতে অক্ষম। যুদ্ধের ময়দানেও তিনি আদর্শ। আদর্শ সৈনিক, আদর্শ সেনাপতি, আদর্শ বিজয়ী হিসেবে হযরতের সমকক্ষ কোন মানুষই ইতিহাসে পাওয়া যাবে না। হযরত নিজের জীবনে সাতাশটি যুদ্ধের মধ্যে নয়টিতে সেনাপতিত্ব করেছেন। যুদ্ধে তার নীতি ছিল, বিপক্ষের আক্রমণকারী সৈন্য ব্যতীত আর কাউকে আক্রমণ না করা। সাধারণ নাগরিক, ধর্মস্থান, নারী, শিশু, বৃদ্ধ, ফসলের জমি, ফলবান বৃক্ষ, জীব-জানোয়ার প্রভৃতির উপর হামলা করা কঠোরভাবে নিষেধ ছিল। যুদ্ধ-বন্দিদের আরাম ও খাওয়ার ব্যবস্থা না করে নিজের সৈন্যদের আরাম করা নিষিদ্ধ ছিল।

সন্ধির বেলায় হযরতই বিশ্বের আদর্শ হওয়ার গৌরব অর্জন করেছেন। অপরপক্ষ সন্ধি ভঙ্গ না করা পর্যন্ত তিনি সন্ধির শর্ত কখনো লঙ্ঘন করেননি। নবীর আদর্শ সবক্ষেত্রে এইরূপে শান্তিকামী বলেই আল্লাহ পাক ঘোষণা করেছেন ঃ وَمَا اَرْسَلْنَاكَ اِلَّا رَحْمَةً لِلْعَالَمِيْنَ

"সমগ্র বিশ্বের জন্যে শুধু রহমত হিসেবে আপনাকে প্রেরণ করেছি।"

মহানবী শুধু রহমাতুললিল মুসলিমীন বা রহমাতুললিন নাসই নন। অর্থাৎ তিনি যে আদর্শ প্রতিষ্ঠা করে গেছেন তা শুধু মানুষের মাঝেই শান্তি আনে না, জীবজগৎ এবং বস্তুজগতেও তা অশান্তির প্রতিরোধ করে। পক্ষান্তরে আধুনিক সভ্যতা প্রাকৃতিক জগতেও অশান্তি সৃষ্টি করে চলেছে। নবীর আদর্শ ব্যতীত মানুষ শান্তি প্রতিষ্ঠার জন্যে যত চেষ্টাই করুক তা অশান্তি বৃদ্ধিই করবে। আল্লাহ পাক তাই বজ্রকঠোর ভাষায় জানিয়ে দিয়েছেন ঃ

ظَهَرَ الْفَسَادُ فِى الْبَرِّ وَالْبَحْرِ بِمَا كَسَبَتْ اَيْدِى النَّاسِ ـ

"জলে স্থলে যে বিশৃঙ্খলা বিরাজ করছে তা মানুষ নিজ হাতেই অর্জন করেছে।" (রূম ঃ ৪১)

এভাবে বিচার করলে গোটা নবী জীবনই মানুষের জন্য অকৃত্রিম আদর্শ। কিন্তু বর্তমানে কোন দেশে মহানবীর আদর্শ পূর্ণভাবে প্রতিষ্ঠিত নেই বলে সে আদর্শকে একটি 'থিওরি' হিসেবে অধ্যয়ন করতে হচ্ছে। শুধুমাত্র চিন্তাশীল লোকের পক্ষেই কোন আদর্শকে থিওরি হিসেবে উপলব্ধি করা সম্ভব। কিন্তু যখন কোন মতবাদ বা থিওরি মানুষের সমাজে বাস্তবে প্রতিষ্ঠা লাভ করে তখনই কেবল সাধারণ মানুষ চিন্তা গবেষণা ছাড়াই তার প্রকৃত রূপ উপলব্ধি করতে পারে। এজন্যেই নবীজীর আদর্শের বাস্তব প্রয়োগ ছাড়া সাধারণ মানুষের পক্ষে নবী জীবনকে সঠিকভাবে অনুধাবন করা অসম্ভব।

তাই যারা হযরতকে নবী বলে স্বীকার করেন, তাঁর আদর্শকে অনুসরণযোগ্য বলে প্রচারও করেন, তাদেরকে নবীর আদর্শ বাস্তবে প্রতিষ্ঠা করে এর প্রকৃত রূপ বিশ্ববাসীর সামনে তুলে ধরতে হবে। সে চেষ্টা না করে যদি তারা শুধু মিলাদ মাহফিলে নবী জীবনের গুণাবলি চর্চা করেন তাহলে কোন দিনই তার আদর্শ সম্পর্কে সাধারণ মানুষকে স্পষ্ট ধারণা দেওয়া সম্ভব হবে না।

www.bjilibrary.com

রাসূল (স) তাঁর আদর্শ সম্পর্কে মানুষকে ওয়াজ নসীহত করেই দায়িত্ব শেষ করেননি; আল্লাহর দেওয়া একমাত্র সত্য জীবন ব্যবস্থাকে (দীনে হক) দুনিয়ার বুকে কায়েম করে মানুষের সামনে নবীর আদর্শ তুলে ধরার জন্যে আল্লাহ পাক তাঁকে প্রেরণ করেছেন। কুরআন মজীদে এ সম্পর্কে সুস্পষ্ট উল্লেখ রয়েছে। আল্লাহ বলেন ঃ

هُوَالَّذِىْ اَرْسَلَ رَسُوْلَهُ بِالْهُدٰى وَدِيْنِ الْحَقِّ لِيُظْهِرَهُ عَلَى الدِّيْنِ كُلِّهِ -

"তিনিই (ঐ সত্তা) যিনি তাঁর রাসূলকে হেদায়াত ও সত্য দীনসহ প্রেরণ করেছেন যেন (রাসূল) অন্যান্য সমস্ত দীনের (বাতিল দীনের) উপর এ দীনকে বিজয়ী করেন।" (আত তাওবা ঃ ৩৩, আল ফাতহ্ ঃ ২৮, আস সাফ ঃ ৯)

যতদিন পর্যন্ত আল্লাহ প্রদত্ত এই সত্য জীবন ব্যবস্থা আরবে প্রতিষ্ঠিত হয়নি ততদিন পর্যন্ত এর সত্যতা প্রকাশিত হয়নি। মদীনাতে এই আদর্শের ভিত্তিতে সমাজ গঠন হওয়ার পূর্বে মাত্র কিছু সংখ্যক চিন্তাশীল ও সত্যানুসন্ধানী মানুষ তা গ্রহণ করেছিলেন। কিন্তু এ দ্বীনে হক যখন বাস্তবে প্রতিষ্ঠিত হল এবং সাধারণ মানুষ তার সৌন্দর্য দেখতে পেল তখন দলে দলে তারা তা গ্রহণ করতে এগিয়ে এল। কেননা তখন তারা স্পষ্ট বুঝতে পারল যে, নবীর দীনই একমাত্র সত্য এবং অন্যান্য সকল দীন একেবারেই বাতিল। নবীর দীন প্রতিষ্ঠিত হবার আগে তা যে একমাত্র হক তা প্রকাশিত হয়নি, ফলে তা বিজয়ী হতে পারেনি।

সুতরাং নবীজীবনের আদর্শ শুধু আলোচনা ও প্রশংসার মধ্যে সীমাবদ্ধ রাখার বিষয় নয়; বরং দীন প্রতিষ্ঠার মাধ্যমে এর বাস্তব রূপ ও সত্যতা প্রকাশের জন্য জান-মাল কোরবানী করাই চরম লক্ষ্য হওয়া উচিত। যারা নবীর আদর্শকে জীবনের উদ্দেশ্য হিসেবে গ্রহণ করতে রাযী নয় তাদের মুসলিম হওয়ার দাবি নবীর জীবনাদর্শের ক্ষতিই করে থাকে। যারা নবীর আদর্শকে শুধুমাত্র ধর্মীয় ও ব্যক্তিগত জীবনের কোন অংশে পালন করে সমাজে ধর্মনেতা হিসেবে পরিচিত হয়েছেন তারা নবীর আদর্শ প্রতিষ্ঠার আন্দোলনে এগিয়ে এলে সাধারণ মুসলমান এ পথে জান-মাল কুরবান করতে সহজেই প্রস্তুত হবে।

আদর্শ প্রতিষ্ঠায়

মহানবীর আদর্শ কিভাবে কোন্ পদ্ধতিতে প্রতিষ্ঠা করতে হবে? প্রতিষ্ঠা করার পদ্ধতিগত আদর্শও তিনি দেখিয়ে গেছেন। তাঁর কাছ থেকেই তা গ্রহণ করতে হবে। তাই তাঁর জীবনকে আদর্শ হিসেবে গ্রহণ করে নিজ নিজ চিন্তা, বুদ্ধি ও রুচি অনুযায়ী পদ্ধতি আবিষ্কার করার কোন অবকাশ নেই। তাঁর আদর্শ প্রতিষ্ঠার কর্মপন্থায়ও তিনিই একমাত্র আদর্শ। ব্যক্তি গঠনের কঠিন স্তর অতিক্রম না করে, ইসলামের জ্ঞানে সমৃদ্ধ , ঈমানের বলে বলীয়ান ও চরিত্র সুসজ্জিত একটি দল গঠনের আন্দোলন ব্যতীত এবং সমাজে এই দলের লোকদের নেতৃত্ব প্রতিষ্ঠা করার একনিষ্ঠ প্রচেষ্টা ছাড়া অন্য কোন পথেই সে আদর্শ কায়েম হতে পারে না। এ প্রচেষ্টার স্বাভাবিক প্রতিক্রিয়া হিসেবে অনৈসলামী সমাজের নেতৃবৃন্দ ঐ দলের উপর অত্যাচার করবেই। হককে প্রতিষ্ঠা করার পথে বাতিলের সাথে টক্কর অবশ্যই হবে। এটা এড়িয়ে ইসলামকে কায়েম করতে চাইলে তা শুধু ধর্মীয় আচার অনুষ্ঠানে সীমাবদ্ধ রেখেই সম্ভব। গোটা দীনকে প্রতিষ্ঠা করা সম্ভব নয়।

www.bjilibrary.com

স্বীকৃত আদর্শ

উপসংহারে একটা কথা প্রকাশ করা প্রয়োজন। হযরত মুহাম্মদ (স)-কে জীবনের সর্বক্ষেত্রেই অনুকরণ ও অনুসরণযোগ্য আদর্শ হিসেবে স্বীকার করা ছাড়া মানুষের উপায় নেই। ব্যক্তি ও সমাজ জীবনে এমনকি যুদ্ধের ময়দানে এবং আন্তর্জাতিক সম্পর্কের বেলায় তাঁর দেওয়া নিখুঁত আদর্শকে অগণিত চিন্তাশীল অমুসলিম ব্যক্তিও প্রশংসা করতে বাধ্য হয়েছেন। কিন্তু নবীকে আদর্শ স্বীকার করেও তারা তাঁকে অনুসরণ করতে পারেনি। হযরতের আদর্শকে গ্রহণ করার মত সাহস ও যোগ্যতা না থাকলেও বিশ্বের মানুষ সে আদর্শের প্রশংসা করতে দ্বিধাবোধ করেনি। মুসলমানরাও যদি ঐসব অমুসলিমের ন্যায় নবীর আদর্শকে বাস্তব জীবনে প্রয়োগ না করে, তারাও যদি শুধু মুখে মুখে স্বীকার করেই মুক্তি পেতে চায় তবে কোন্ কারণে আল্লাহ্ পাক তাদেরকে ক্ষমার যোগ্য মনে করবেন? কি কারণে অমুসলিমদের থেকে তাদের মর্যাদার পার্থক্য হবে? প্রবৃত্তির দাসত্ব আর ভোগসর্বস্ব জড়বাদী জীবন যাপনে অভ্যস্ত মানুষের কাছে মহানবীর নিষ্কলুষ জীবনাদর্শকে বাস্তবে অনুসরণ কঠিন বলে মনে হতে পারে। কিন্তু তাঁর আদর্শের শ্রেষ্ঠত্ব অস্বীকার করে কারও পক্ষে মনুষ্যত্বের দাবি করা সম্ভব নয়। আধুনিক বিজ্ঞান মানুষকে জানতে দিয়েছে অনেক অজানা রহস্য, উড়তে শিখিয়েছে মহাশূন্যে, আয়ত্তে এনে দিয়েছে জীবনে আরাম আয়েশের উপকরণ, আবিষ্কার করেছে সে প্রলয় সৃষ্টিকারী মারণাস্ত্র। কিন্তু দুনিয়ার বুকে 'মানুষ' হিসেবে জীবন যাপন করার পথ সে আবিষ্কার করতে পারেনি। সে পথ দেখিয়েছে মহানবীর আদর্শ। মানুষের মর্যাদা নিয়ে বাঁচতে চাইলে, মনুষ্যত্বের বিকাশ সাধন করতে হলে, সৃষ্টির শ্রেষ্ঠ জীবের মর্যাদায় প্রতিষ্ঠিত হতে চাইলে, সর্বোপরি মানুষের সমাজে শান্তি প্রতিষ্ঠিত করতে চাইলে বিশ্বনবী হযরত মুহাম্মদ (স)-এর নিকট দীক্ষা গ্রহণ করা ছাড়া আর কোন দ্বিতীয় পথ নেই।

www.bjilibrary.com

বিশ্বনবীর চরিত্র গঠন পদ্ধতি

সূচনা

আমাদের দেশের নেতৃবৃন্দ বার বার জাতির চারিত্রিক দুর্গতির কথা উল্লেখ করে থাকেন এবং জাতির উন্নতির জন্য চরিত্র গঠনের গুরুত্ব সম্পর্কে অবিরাম বহু মূল্যবান নসিহত খয়রাত করেন। কিন্তু দুঃখের বিষয়, তারা প্রায়ই চরিত্রহীন বা সীমাবদ্ধক্ষেত্রে 'চরিত্রবান' সমাজ থেকেই এর সবক গ্রহণ করেন। তারা এমন সব কর্মসূচি ও কর্মপদ্ধতি অবলম্বন করেন যা বাস্তবক্ষেত্রে চরিত্রের ভিত্তিমূলকেই ধ্বংস করে ছাড়ে। সমাজের চিন্তাশীল ব্যক্তিদের আজ তাই চরিত্র গঠনের সঠিক পদ্ধতি সম্বন্ধে যুক্তিভিত্তিক আলোচনা ও তথ্যভিত্তিক গবেষণার দিকে মনোযোগী হওয়া দরকার।

আরবে বর্বর সমাজের লোকদের মধ্যে বিশ্বনবী হযরত মুহাম্মদ (স) যে উন্নত মানের চরিত্র সৃষ্টি করতে সক্ষম হয়েছিলেন, তাকে ইতিহাসের বিস্ময় মনে করাই যথেষ্ট নয়; কোন্ পদ্ধতি অবলম্বন করে মহানবী সে বিস্ময়ের সৃষ্টি করেছিলেন তা গভীরভাবে অনুসন্ধান করতে হবে। তাঁর অবলম্বিত পদ্ধতি প্রয়োগ করলে সে পরিমাণে না হলেও চরিত্র গঠনের ব্যাপারে বিপুল সাফল্য অবশ্যম্ভাবী। বিশ্বনবীর চরিত্র গঠন পদ্ধতিকে উদার উন্মুক্ত মন নিয়ে উপলব্ধি করতে হলে প্রথমে চরিত্রের ধারণা, সংজ্ঞা, গুরুত্ব ও ভিত্তি সম্বন্ধে আলোচনা অপরিহার্য।

চরিত্রের ধারণায় অরাজকতা

আদর্শের বিভিন্নতার দরুন চরিত্রের ধারায় স্বাভাবিকভাবেই পার্থক্য সৃষ্টি হয়। এক জাতির নিকট যা চারিত্রিক গুণ বলে পরিচিত অন্য জাতির নিকট তা চরিত্রহীনতা বলেও বিবেচিত হতে পারে। এতে আশ্চর্য হওয়ার কোনই কারণ নেই। বিশ্বনবী হযরত মুহম্মদ (স)-এর অনুসারী হওয়ার দাবিদার হওয়া সত্ত্বেও আজ মুসলমানদের মধ্যেই চারিত্রিক গুণ সম্বন্ধে বিচিত্র ও বিভিন্ন প্রকার ধারণা পাওয়া যায়। প্রধানত রাসূলের জীবনাদর্শ সম্পর্কে ধারণা ও জ্ঞানের পার্থক্যের দরুনই চরিত্র সম্বন্ধে তাদের মধ্যেই বিভিন্নতার সৃষ্টি হয়েছে।

কিন্তু ইসলাম সম্বন্ধে যাদের ধারণায় মোটামুটি মিল রয়েছে তাদের মধ্যেও চারিত্রিক গুণাবলির ধারণা সম্পর্কে যথেষ্ট পার্থক্য দেখা যায়। কতেক লোক নিতান্ত অপ্রয়োজনীয় গুণকেও অত্যাবশ্যক মনে করেন। অথচ বহু অপরিহার্য গুণাবলিকেও অনাবশ্যকের তালিকায় স্থান দেন। এক ব্যক্তির চরিত্রের বহু মৌলিক গুণ থাকা সত্ত্বেও চুল, পোষাক, দাড়ি ইত্যাদি বিশেষ ধরনের না হওয়ার দরুন তাকে ইসলামের দৃষ্টিতে উন্নত চরিত্রবান মনে করা হয় না। অথচ কতেক মৌলিক গুণের অভাব সত্ত্বেও একব্যক্তির বাহ্যিক আকারকেই চারিত্রিক উন্নতির অধিকারী বিবেচনা করা হয়। জীবনের অনেক গুরুত্বপূর্ণ ফরযকে ত্যাগ করেও কেউ হয়তো নফল ও মুস্তাহাবের জোরে মহান ও চরিত্রবান বলে পরিচিত হয়।

www.bjilibrary.com

চরিত্রের ধারণার এসব ভ্রান্তি ও অসামঞ্জস্য সম্পর্কে গবেষণা করলে দেখা যাবে যে, চরিত্র গঠন পদ্ধতির পার্থক্যই এর প্রধান কারণ। একই রাসূলকে আদর্শ হিসেবে গ্রহণ করার পর আন্তরিকতা সত্ত্বেও চরিত্রের ধারণায় এত পার্থক্য হওয়া অস্বাভাবিক। এ অস্বাভাবিকতা চরিত্র গঠন পদ্ধতির বিভিন্নতার পরিণাম। তাই অত্যন্ত সতর্কতার সাথে এবং কারও প্রতি কোন প্রকার বিদ্বেষ পোষণ না করে উদার মনোভাব নিয়ে বিশ্বনবী কর্তৃক গৃহীত চরিত্র গঠন পদ্ধতির আলোচনা করা প্রয়োজন।

চরিত্র কাকে বলে

চরিত্র কথাটি অত্যন্ত ব্যাপক। মানুষের ক্ষুদ্র বৃহৎ যাবতীয় কার্যাবলিই চরিত্রের অন্তর্ভুক্ত। এমনকি মুখভঙ্গী থেকেও চরিত্রের ধরন বুঝা যায়। মানুষ যাবতীয় অঙ্গ-প্রত্যঙ্গ দ্বারা প্রকাশ্যে ও অপ্রকাশ্যে যা কিছু করে এবং ভাবে ও ভঙ্গীতে যা প্রকাশ করে তা সবই সাধারণভাবে চরিত্রের মধ্যে গণ্য। মানুষের সব কাজ ও ভাব-ভঙ্গীকে ভাল ও মন্দ হিসেবে দু'ভাগে বিভক্ত করা চলে। মন্দটুকুকে অসৎ চরিত্রের পরিচায়ক মনে করা হয়। আর ভালটুকুকেই সচ্চরিত্র বা চরিত্রের লক্ষণ ধরা হয়। চরিত্রহীন বললে অসচ্চরিত্রই বুঝায়। তাই সাধারণভাবে মানুষের সব কাজ কর্মই চরিত্রের অন্তর্ভুক্ত হলেও শুধু গুণবাচক ও প্রশংসাসূচক কাজ ও ভাব-ভঙ্গীকেই চরিত্র বলা হয়।

মানুষ সমাজবদ্ধভাবে জীবন যাপন করতে বাধ্য। অনেক মানুষকে একত্রে বসবাস করতে হলে সবাইকে কতক নিয়ম-কানুন মেনে নিতে হয়। ভাল ও মন্দ সম্বন্ধে তাদের ধারণা যেরূপ থাকে তাদের নিয়ম-কানুন সেরূপ হয়। যেসব কাজকে তারা ভাল মনে করে সে সবকে সমাজে চালু করা এবং যেগুলোকে তারা মন্দ মনে করে সেসবকে সমাজ থেকে উৎখাত করার জন্য আইন-কানুন, শিক্ষা-দীক্ষা, আদালত ফৌজদারি ও শাসন শৃঙ্খলার ব্যবস্থা করা হয়।

ভাল ও মন্দের ধারণার ভিত্তিতে শিশুকাল থেকেই চরিত্র গঠনের প্রয়োজন হয়। কোন কালেই কোন সমাজে চরিত্র গঠনকে অপ্রয়োজনীয় মনে করা হয়নি। অতীত এবং বর্তমানে চরিত্রের ধারণায় বিভিন্ন সমাজে বিস্তর পার্থক্য পাওয়া গেলেও সব সমাজে নিজ নিজ ধারণা মোতাবেক চরিত্র গঠনকে অত্যন্ত গুরুত্ব প্রদান করা হয়েছে। কেননা সমাজে যার যেমন খুশি তেমনিভাবে স্বেচ্ছাচারীর ন্যায় সবাইকে চলতে দিলে বিশৃঙ্খলা, অশান্তি ও অরাজকতা অবশ্যম্ভাবী। ইতিহাসে এমন কোন অসভ্যতম সমাজের সন্ধান পাওয়া যায় না যেখানে চরিত্রের কোন ধারণাই ছিল না। আজও যে সব মানব গোষ্ঠীকে আমরা অসভ্য মনে করি তাদেরও চরিত্রবোধ আছে এবং তাদের নিজস্ব ধারণা অনুযায়ী তারা চরিত্র গঠন করে।

একটু তলিয়ে দেখলেই বুঝা যায় যে, পারিবারিক নিয়মনীতি থেকে আরম্ভ করে রাজনৈতিক, অর্থনৈতিক ও তামাদ্দুনিক যাবতীয় বিধি-নিষেধ, স্কুল-কলেজ, মকতব-মাদরাসা, খানকাহ ও আশ্রম, শাসন ও বিচার, জেল ও জরিমানা এ সবেরই মূল উদ্দেশ্য হচ্ছে চরিত্র গঠন ও নিয়ন্ত্রণ। সমাজের সবাই যাতে প্রচলিত চারিত্রিক গুণাবলি

www.bjilibrary.com

অর্জন করতে সক্ষম হয় এবং চরিত্রের বিপরীত কাজ থেকে স্বেচ্ছায় বা বাধ্য হয়ে বিরত থাকে এর জন্য সমাজপতি ও রাষ্ট্র পরিচালকদের চিন্তার অন্ত নেই। অবশ্য সমাজ ও রাষ্ট্রের নেতৃবৃন্দ যে ধরনের চরিত্র পছন্দ করে সে ধরনের চরিত্র গঠনের জন্যই ব্যবস্থা অবলম্বন করেন। কিন্তু চরিত্রের ধরন যাই হোক চরিত্র গঠনের উপর গুরুত্ব আরোপ না করে কারো উপায় নেই। এ কথাও সত্য যে, চরিত্র গঠনের উদ্দেশ্যে যে কোন আইন বা শিক্ষাই সাফল্য অর্জন করতে পারে না। আন্তরিকতা সত্ত্বেও ভ্রান্ত শিক্ষাপদ্ধতি ও ত্রুটিপূর্ণ আইনের ফলে চরিত্র গঠনের উদ্দেশ্য ব্যর্থ হয়ে যায়। এ ক্ষেত্রে চরিত্র গঠনের পন্থা ভুল হওয়ার ফলেই এরূপ হয়ে থাকে; চরিত্রের গুরুত্ব না বুঝবার কারণে নয়। মোটকথা চরিত্র গঠনের গুরুত্ব কেউ অস্বীকার করে না।

জাতি গঠনে চরিত্রের স্থান

বর্তমানে প্রায় সব ক'টি মুসলিম দেশেই চরিত্রের ব্যাপারে চরম অচলাবস্থার সৃষ্টি হয়েছে। কারণ চরিত্র সম্পর্কে শাসক শ্রেণীর ধারণা অনেক ক্ষেত্রেই মুসলিম জনগণের ধারণার সম্পূর্ণ বিপরীত। তাই জাতি গঠনের ব্যাপারে চরিত্রের উপর যেরূপ গুরুত্ব দেওয়া উচিত তা মোটেই সম্ভব হচ্ছে না। কুরআন-সুন্নাহর ভিত্তিতে মুসলিম জনগণ ভাল কাজ ও মন্দ কাজের যে ধারণা পোষণ করে, শাসক গোষ্ঠীর ভাল ও মন্দের মাপকাঠি প্রায়ই এর বিপরীত। সরকার ও জনগণের পূর্ণ সহায়তা ও সহযোগিতা ব্যতীত জাতি গঠনের কাজ তরান্বিত হওয়া দূরের কথা; শুরু করাই অসম্ভব। মুসলিম দেশগুলোতে শাসক ও শাসিতের মধ্যে চরিত্রবোধের ক্ষেত্রে মৌলিক পার্থক্য থাকায় জাতি গঠনের কাজ ব্যাপকভাবে ব্যাহত হয়ে আছে।

যে জাতির নির্ভরযোগ্য চরিত্রসম্পদ নেই সে জাতিকে বিশ্বের সকল দেশও যদি বস্তু-সম্পদ খয়রাত করতে থাকে, তবু উন্নত জাতি হিসেবে দুনিয়ায় সে মাথা তুলে দাঁড়াতে পারবে না। আর যে জাতি চরিত্রের দিক দিয়ে সম্পদশালী তার জাগতিক কোন অভাবই অপূর্ণ থাকে না। কিন্তু চরিত্রের সম্বল থেকে বঞ্চিত জাতি আর কোন সম্পদ দ্বারাই চরিত্রের অভাব পূরণ করতে পারে না। তাই বিশ্বের প্রত্যেকটি উন্নত রাষ্ট্র জাতীয় মূল্যবোধের ভিত্তিতে চরিত্র গঠনকে জাতির পুনর্গঠনের পরিকল্পনায় সবচেয়ে বেশি গুরুত্বদান করে।

চরিত্রের ভিত্তি

পূর্বেই বলা হয়েছে যে, কর্মই চরিত্র। সুতরাং কর্মের ভিত্তিই চরিত্রের ভিত্তি। মানুষের প্রত্যেকটি কর্মের পেছনেই কোন না কোন অভ্যন্তরীণ প্রেরণা বিরাজ করে। ভেতরের সে তাগিদই তাকে কর্মের জন্যে উদ্বুদ্ধ করে। সে প্রেরণা দানকারী শক্তিরই অপর নাম উদ্দেশ্য। মানুষ বিনা উদ্দেশ্যে কোন কাজই করে না। উদ্দেশ্য নির্ধারণে ভুল হতে পারে, কিন্তু সুস্থ মস্তিষ্কসম্পন্ন কোন মানুষই উদ্দেশ্যহীনভাবে কোন কাজ করে না। মানুষ পয়লা একটা বিশেষ উদ্দেশ্য স্থির করে নেয়, এরপর ঐ উদ্দেশ্য হাসিল করার জন্য কর্মে নিয়োজিত হয়।

www.bjilibrary.com

মানুষ জীবনের জন্য যে লক্ষ্য নির্ধারণ করে সেখানে পৌঁছার জন্যই সে সর্বপ্রকার চেষ্টা সাধনা করে থাকে। কেননা জীবনের সাফল্য সে লক্ষ্যে পৌঁছার উপরই চূড়ান্তভাবে নির্ভর করে। কৃতকার্যতা ও সাফল্য লাভের জন্য চেষ্টা করা প্রত্যেক মানুষের ফিৎরাত বা স্বভাব ধর্ম। কিন্তু সাফল্য সম্পর্কে সকলের ধারণা এক নয়। যার যা উদ্দেশ্য তা লাভ করতে পারলেই সে সফল হয়েছে মনে করে। এ জন্যই সবাই নিজ উদ্দেশ্য হাসিল করার জন্য আপ্রাণ চেষ্টা ও অক্লান্ত পরিশ্রম করে।

একথা স্পষ্ট যে, উদ্দেশ্য চরিত্রের ভিত্তি; কিন্তু উদ্দেশ্যের উৎস কোথায়? জীবনের উদ্দেশ্য যদি সবারই একরূপ হতো তাহলে বলা যেতো যে, সহজভাবে মানুষ মাত্রই সে উদ্দেশ্য স্থির করে নেয়। কিন্তু জীবনের জন্য বিভিন্ন ধরনের উদ্দেশ্য আপনা আপনিই স্থির হয়ে যায় না। উদ্দেশ্য নির্ধারণের ব্যাপারে জগৎ এবং জীবন সম্বন্ধে কতক মৌলিক বিশ্বাসই উৎস হিসেবে কাজ করে। আমার জীবন কি ইহকালেই শেষ, না এ জগতের পরেও কোন জীবন হবে? শুধু এ প্রশ্নটির ভিত্তিতে যে দু'প্রকার বিশ্বাস জন্ম নেয় তাতেই তো জীবনের দুটো সম্পূর্ণ বিপরীত উদ্দেশ্য সৃষ্টি হয়। যে ব্যক্তি পরকালের প্রতি বিশ্বাসী নয় তার জীবনের সাফল্য এ দুনিয়াতেই সীমাবদ্ধ। তার নৈতিকতাবোধ ও মূল্যমান পার্থিব জীবনে সাফল্য লাভের দ্বারাই নিয়ন্ত্রিত হবে। তার জীবনের চরম উদ্দেশ্য হবে দুনিয়ায় সাফল্যময় জীবন যাপন করা। দুনিয়ার সুখ-সম্পদ, মান-ইজ্জত, যশ-খ্যাতি ও প্রভাব-প্রতিপত্তিই তার কর্মজীবনের মূল প্রেরণা যোগাবে।

কিন্তু যে ব্যক্তি আখিরাতের প্রতি ঈমান এনেছে সে প্রত্যেক কাজেই পরকালের সুখ-স্বাচ্ছন্দ্য ও সাফল্য তালাশ করবে। যে কাজ পরকালে তার ব্যর্থতার কারণ হবে বলে তার বিশ্বাস সে কাজের দ্বারা ইহকালের সুখ ও যশের নিশ্চয়তা থাকলেও সে তা ত্যাগ করবেই। সুতরাং এ কথা প্রমাণিত হলো যে, মানুষ জগৎ ও জীবন সম্পর্কে যে ধরনের বিশ্বাস পোষণ করে তার জীবনের উদ্দেশ্যও অনুরূপই হয়ে থাকে। মনস্তাত্ত্বিক দিক দিয়ে এটা কিছুতেই সম্ভব নয় যে, কারো জীবনের উদ্দেশ্য তার বিশ্বাসের বিপরীত হবে। তাই সর্বশেষ পর্যায়ে বিশ্বাসই চরিত্রের ভিত্তি হয়ে দাঁড়ায়। কেননা বিশ্বাসই কর্মের প্রেরণা যোগায়। কর্ম বিশ্বাসেরই ফল, আর বিশ্বাস কর্মেরই মূল।

চরিত্র গঠনের স্বাভাবিক পদ্ধতি

মানুষের চরিত্র শূন্যে সৃষ্টি হয় না। বাস্তব কর্মজীবনেই চরিত্রের বিকাশ হয়। নিষ্ক্রিয়তার মধ্যে চরিত্র সৃষ্টি হতে পারে না। যে ব্যক্তি বৈরাগ্য জীবন যাপন করে তার চরিত্র গঠন হবার কোন পথ নেই। যে ব্যক্তি কথাই বলে না, সে মিথ্যাবাদীও নয়; সত্যবাদীও নয়। কথা বলার মাধ্যমেই তার চরিত্রের এক অংশ প্রকাশ পায়। দুষ্কর্ম নিশ্চয়ই অসচ্চরিত্রের লক্ষণ; কিন্তু কর্মহনীতা চরিত্রের পরিচায়ক নয়। কতক বিশ্বাসের ভিত্তিতে জীবনের যে উদ্দেশ্য নির্ধারিত হয় সে উৎস থেকেই কর্মের ধারা প্রবাহিত হয় আর কর্মের মাধ্যমেই চরিত্রের বিকাশ লাভ ঘটে।

www.bjilibrary.com

উপর্যুক্ত যুক্তি মেনে নিলে চরিত্র গঠনের স্বাভাবিক পদ্ধতিটি বোধগম্য হতে পারে। মানুষ যখনই কোন কিছুকে জীবনের উদ্দেশ্য হিসেবে গ্রহণ করে তখন থেকেই সে উদ্দেশ্য তাকে এক বিশেষ কর্মে নিয়োজিত করে। সে যখন উক্ত উদ্দেশ্য হাসিল করার জন্য নিজেকে কর্ম সাধনায় নিয়োগ করে তখন স্বাভাবিকভাবেই তাকে অনেক কিছু ত্যাগ করতে হয়। উদ্দেশ্যটি তার জীবনের বৃহত্তর লক্ষ্য বলে অপেক্ষাকৃত ক্ষুদ্র অনেক স্বার্থ তাকে ত্যাগ করতে হয়। এ ত্যাগের দ্বারাই তার মধ্যে চরিত্রগুণের সমাবেশ ঘটতে থাকে। প্রত্যেকটি ত্যাগই এক একটি চরিত্রগুণ। এ সম্বন্ধে কয়েকটি উদাহরণ নিয়ে আলোচনা প্রয়োজন।

এক ব্যক্তি বড় ব্যবসায়ী হওয়াকেই জীবনের উদ্দেশ্য স্থির করলো। এর স্বাভাবিক পরিণতি হবে এই যে, সে তার সমস্ত সময়, বুদ্ধি ও শ্রমকে এ উদ্দেশ্য হাসিলের জন্য ব্যবহার করবে। স্ত্রী সন্তানাদি ও বন্ধু-বান্ধবদের সাথে স্ফূর্তি করে সময় নষ্ট করতে সে রাযী হবে না। খাওয়া ও শোয়ার ব্যাপারে তাকে অনেক আরাম ও বিলাস ত্যাগ করতে হবে। সততা ও বিশ্বস্ততার প্রমাণ দিয়ে তাকে গ্রাহক ও অন্যান্য ব্যবসায়ীদের আস্থাভাজন হতে হবে।

এভাবেই বড় ব্যবসায়ী হওয়ার উদ্দেশ্য তার মধ্যে অনেকগুলি চরিত্রগুণ সৃষ্টি করবে। সে জীবনে কর্তব্যপরায়ণ, পরিশ্রমী, যোগ্য, বিশ্বাসভাজন, সময়নিষ্ঠ ও অঙ্গীকার রক্ষাকারী হিসেবে পরিচিত হবে। কিন্তু বড় ব্যবসায়ী হওয়াই জীবনের লক্ষ্য বলে তার মধ্যে প্রয়োজনবোধে অনেক সমাজবিরোধী দোষের সমাবেশও ঘটতে পারে। সে যদি দেখতে পায় যে, কালোবাজারী, মুনাফাখোরী, ঘুষদান ইত্যাদি ব্যতীত রাতারাতি বড় ব্যবসায়ী হওয়া সম্ভব নয় তাহলে সে অত্যন্ত যোগ্যতার সাথে এসবও করবে। এভাবে তার মধ্যে কতক দোষ ও কতক গুণ সৃষ্টি হবে। বড় হওয়াকে জীবনের উদ্দেশ্য স্থির করার সময়েই চরিত্র সম্বন্ধে তার এ জাতীয় ধারণা গড়ে উঠবে।

আর এক ব্যক্তি দেশের স্বাধীনতা অর্জনকে জীবনের লক্ষ্য হিসেবে গ্রহণ করলো। এ লক্ষ্যটি তার নিকট অনেক প্রকার ত্যাগ দাবি করবে। তাকে আত্মীয়-পরিজনের ভালোবাসা ও ব্যক্তিগত সুখ-স্বাচ্ছন্দ্য থেকে দেশের আযাদীকে বেশি পছন্দ করতে হবে। দীর্ঘকাল পর্যন্ত কারা-যন্ত্রণা ভোগ করতে হলেও এ কঠিন পথেই সে এগিয়ে চলবে। আবার দেশের আযাদীর প্রয়োজনে যদি মানবতাবিরোধী কাজ করাও অত্যাবশ্যক মনে হয়, তা হলে সেপথও সে গ্রহণ করবে। কোন দল বা ব্যক্তিকে প্রবঞ্চনা করা দরকার মনে করলে দ্বিধাহীন চিত্তে সে তাও করবে।

কতক লোক যদি সাফল্যের সাথে ডাকাতি করাকেই জীবনের লক্ষ্য ঠিক করে নেয় তাহলে তাদের মধ্যেও কতক চরিত্রগুণ সৃষ্টি হবে। তাদের মধ্যে একত্ববোধ, সর্দারের প্রতি আনুগত্য, পারস্পরিক বিশ্বাস ইত্যাদি মহান কতক চরিত্রগুণের বিকাশ ঘটবে। তাদের কেউ পুলিশ কর্তৃক ধৃত হলে জীবন দিতে রাযী হবে, কিন্তু সহকর্মী ডাকাত ভাইদেরকে ধরিয়ে দিবে না। তাদের কেউ আক্রান্ত হলে জীবন দিয়ে তাকে রক্ষা করার চেষ্টা করবে।

www.bjilibrary.com

যে ব্যক্তি দেশের উন্নতিকে চরম লক্ষ্য নির্ধারণ করে সে নিজের দেশের স্বার্থের জন্য ব্যক্তিগত, পারিবারিক ও বংশীয় সকল স্বার্থকে উপেক্ষা করতে পারে। প্রয়োজন হলে প্রতিবেশী রাষ্ট্রকে ক্ষতিগ্রস্ত করেও নিজের দেশের উন্নতি করতে চেষ্টা করবে। ইংরেজ জাতির নেতৃবৃন্দ নিজের দেশের উন্নতির জন্য বহু দেশকে শোষণ ও অত্যাচার করেছে। ইংরেজরা আপন দেশের অভ্যন্তরীণ শক্তি বৃদ্ধির জন্যে নাগরিকদের মধ্যে ব্যক্তি স্বাধীনতা কায়েম করতে চেষ্টা করেছে। কিন্তু তারা নিজ দেশের ও জাতির প্রয়োজনে অন্য বহু দেশের মানুষকে দাসত্ব-শৃঙ্খলে আবদ্ধ করেছে।

এসব উদাহরণ থেকে প্রমাণিত হয় যে, স্বাভাবিকভাবে চরিত্র সৃষ্টির পদ্ধতিটি কি। মানুষ জীবনের একটা লক্ষ্য স্থির করে নিয়ে সে লক্ষ্যে পৌঁছার জন্যে আপ্রাণ চেষ্টা করতে থাকে। এ চেষ্টার ফলেই এক বিশেষ ধরনের চরিত্র গড়ে উঠে। এ পদ্ধতিটি এ জন্যই স্বাভাবিক যে জীবনের লক্ষ্য বা উদ্দেশ্য লাভ করা দ্বারাই সাফল্য অর্জিত হয় এবং সাফল্য লাভের তীব্র আকাঙ্ক্ষা থাকা মানুষের স্বভাব।

লক্ষ্যের শ্রেষ্ঠত্বই উন্নত চরিত্রের ভিত্তি

উপরের উদাহরণগুলো থেকে দেখা গেল যে, জীবনের উদ্দেশ্য যত বিরাট ও মহান হবে চারিত্রিক গুণ সে পরিমাণেই উন্নত হবে। আর উদ্দেশ্য যত সংকীর্ণ ও নিকৃষ্ট হবে চরিত্র তত জঘন্য হবে, যদিও উদ্দেশ্যের ক্ষেত্র পর্যন্ত কতক গুণও সৃষ্টি হতে পারে। বড় ব্যবসায়ী হওয়া নিছক ব্যক্তিগত স্বার্থের উদ্দেশ্যেই হতে পারে। কিন্তু এর মধ্যে সততা, কর্তব্যপরায়ণতা ইত্যাদি গুণের বিকাশ হয় বলেই সে উদ্দেশ্য মহান নয়। তাই এ সংকীর্ণ উদ্দেশ্যের প্রয়োজনে সমাজবিরোধী কাজে লিপ্ত হওয়াও স্বাভাবিক। ডাকাতের মধ্যেও অনেক গুণের সমাবেশ হতে পারে; কিন্তু নিকৃষ্ট উদ্দেশ্যের দরুন সে গুণগুলো শুধু ডাকাত ভ্রাতৃত্ব পর্যন্তই সীমাবদ্ধ। ডাকাতদলের বাইরে এরা সবাই মানব সমাজের জন্যে বিভীষিকা। ভারতের নেতা পণ্ডিত নেহেরু তার দেশের উন্নতির জন্যে যত ত্যাগই করুন কিন্তু তার প্রতিবেশী দেশসমূহ ও কাশ্মীরের বেলায় তিনি চরিত্রবান লোকের পরিচয় দেননি। তাঁর চরিত্র ভারতের উন্নতি পর্যন্তই সীমাবদ্ধ ছিল। ইংরেজরা নিজের দেশে যত মহান চরিত্রের পরিচয়ই দিন, এদেশে তাঁরা মানব-দুশমনীর যথেষ্ট পরিচয় দিয়ে গেছেন। আমাদের দেশ থেকে ইংল্যান্ড ও আমেরিকায় উচ্চ শিক্ষা লাভের জন্যে যারা যান, তাদের অনেকেই সে দেশের মানুষের ব্যক্তি চরিত্রে মুগ্ধ হয়ে আসেন। কিন্তু তারা বুঝতে পারেন না যে, তাদের ব্যক্তি এবং জাতীয় স্বার্থ ও উদ্দেশ্যের গণ্ডির মধ্যে যে চারিত্রিক গুণ দেখা যায় সেটা সত্যিকার উন্নতমানের চত্রির নয়। সত্যিকার উন্নত চরিত্র সর্বত্র একইভাবে উন্নত বলে পরিচিত হয়। কিন্তু ডাকাতদল যেমন দলীয় গণ্ডির মধ্যে চরিত্রবান হলেও দলের বাইরে মানবতার দুশমন, তেমনি ঐসব দেশের দায়িত্বশীলরা নিজের দেশে একরূপ চরিত্রের পরিচয় দেয়, কিন্তু দেশের বাইরে তাদের চরিত্রের মান সম্পূর্ণ পৃথক। ডাকাতের মধ্যে বহু চারিত্রিক গুণের বিকাশ দেখে যেমন তাদের জীবনাদর্শ ও উদ্দেশ্যকে গ্রহণযোগ্য

www.bjilibrary.com

বিবেচনা করা মারাত্মক হবে, তেমনি ওসব জাতির আদর্শ ও লক্ষ্যকে অনুসরণ করে যারা আপন দেশের উন্নতি কামনা করে তারাও ভ্রান্ত পথই অবলম্বন করে। উদ্দেশ্যের প্রতি লক্ষ্য না করে বাহ্যিক চরিত্রটুকুকে গ্রহণযোগ্য মনে করলে বিভ্রান্ত হওয়াই স্বাভাবিক। প্রকৃত উন্নত চরিত্রের জন্য উদ্দেশ্যের শ্রেষ্ঠত্ব অপরিহার্য।

বিশ্বনবীর পদ্ধতি

নবী করীম (স) একমাত্র আল্লাহর সন্তুষ্টিকেই মানব জীবনের চরম ও পরম লক্ষ্য নির্ধারিত করেছেন এবং দুনিয়ার বুকে আল্লাহর খেলাফত কায়েম করাকেই সেই সন্তুষ্টি লাভের একমাত্র পথ বলে জানিয়ে দিয়েছেন। ফলে ভাল ও মন্দ, ন্যায় ও অন্যায়, সত্য ও অসত্যের মাপকাঠি কারও ব্যক্তিগত, বংশগত, দলগত বা জাতিগত স্বার্থ দ্বারা রচিত হবে না। আল্লাহর রচিত জীবন বিধান দীন ইসলামকে কায়েম করার চেষ্টাই খেলাফতের দায়িত্ব। এ দায়িত্ব পালনের দিকেই রাসূলুল্লাহ (স) আরববাসীকে আহ্বান জানালেন। তিনি আরব জাতির বা দলবিশেষের স্বার্থ দ্বারা অনুপ্রাণিত হননি। তিনি মানব জীবনের লক্ষ্যকে এমন এক মহান স্তরে উন্নীত করলেন যার চেয়ে শ্রেষ্ঠ কোন উদ্দেশ্য হতেই পারে না।

জীবনের সে মহান লক্ষ্যে পৌঁছবার উপযোগী কর্মপ্রেরণা লাভ করার জন্য তিনি আরববাসীদের নিকট কয়েকটি মৌলিক বিশ্বাস পেশ করলেন। তিনি তাদেরকে এমন এক আল্লাহর প্রতি বিশ্বাস স্থাপন করতে বললেন যিনি সর্বজ্ঞ, সর্বদর্শী, সর্বত্র বিরাজমান, বিধানদাতা এবং কর্মফল প্রদানের চূড়ান্ত মালিক। আখিরাতের চূড়ান্ত সাফল্যকে তিনি মানব জীবনের সাফল্যের মাপকাঠি বলে নির্ধারিত করে দিয়েছেন। জগৎ ও জীবন সম্পর্কে তিনি এমন কতক যুক্তিপূর্ণ বিশ্বাসের দিকে মানুষকে আহ্বান জানালেন যা গ্রহণ করলে সাফল্যের পার্থিব সংকীর্ণ ধারণা থেকে মানুষ মুক্ত থাকতে পারে।

এসব বিশ্বাসের ভিত্তিতে জীবনের যে চরম লক্ষ্য নির্ধারিত হয় তা গ্রহণ করার পর স্বাভাবিকভাবেই এক বিশেষ ধারায় চরিত্র গঠিত হয়। তদানীন্তন আরবের চরিত্রহীন সমাজের লোকদের মধ্যে যাঁরা মহানবীর আহ্বানে সাড়া দিলেন তাদের চরিত্র সঠিকরূপে গঠন করার জন্য তিনি সুষ্ঠু ব্যবস্থা গ্রহণ করলেন। তিনি তাদেরকে কোন শিক্ষাগারে বসিয়ে বসিয়ে শুধু জ্ঞান দান করেননি, কোন নির্জন কোঠায় শুধু ধ্যানে নিযুক্ত করেননি, সমাজে হৈ চৈ সৃষ্টি করার কাজে তাদের ব্যবহার করেননি। তিনি বাস্তব কর্মক্ষেত্রে তাদেরকে নামিয়ে দিলেন। পানিতে না নামিয়ে সাঁতার শিখানো অসম্ভব। তাই যে ক'জন তাঁর দাওয়াত কবুল করলেন তাঁদের প্রত্যেককে তিনি মানব সমাজের প্রশস্ত ও উত্তপ্ত কর্মক্ষেত্রে নিক্ষেপ করলেন। তিনি মানুষকে যে পথে আহ্বান জানাচ্ছিলেন তার অনুসারীদেরকেও সে দাওয়াতের কাজেই নিয়োগ করলেন। ফলে সমাজে আর সব মত ও পথের সাথে তাদের সংগ্রাম শুরু হলো। নবী ও তাঁর সহকর্মীদের জীবনের লক্ষ্যের সাথে যাদের জীবনাদর্শের গরমিল ছিলো তাদের সাথে কর্মক্ষেত্রে সংগ্রাম অনিবার্য। কারণ জীবনের উদ্দেশ্য ও আদর্শ এক না হলেই বাস্তব ক্ষেত্রে সংঘর্ষ বাধে।

www.bjilibrary.com

প্রকৃতপক্ষে এ প্রত্যক্ষ কর্মজীবনেই চরিত্র সৃষ্টি হয়। একমাত্র আল্লাহর সন্তুষ্টিকে চরম লক্ষ্য স্থির করে যারা কর্মক্ষেত্রে অবতীর্ণ হলেন তাদের সাথে প্রথমেই আপন নফস বা প্রবৃত্তির লড়াই শুরু হয়ে গেলো। প্রবৃত্তির দাবিকে ঐ লক্ষ্য অনুযায়ী নিয়ন্ত্রিত করে অগ্রসর হওয়ার জন্য তাদেরকে বহু জাগতিক আপাতমধুর স্বার্থকে ত্যাগ করতে হয়েছে। এরপর সমাজের স্বার্থের সাথে তাদের উদ্দেশ্য ও আদর্শের সংঘাত লেগেছে। এ ক্ষেত্রে তাঁদের উপর অনেক উৎপীড়ন চললো। এখানেও চরম লক্ষ্যে পৌঁছার তাগিদ তাদেরকে অনেক কিছু ত্যাগ করতে উদ্বুদ্ধ করেছে।

প্রত্যেক ব্যক্তিকেই চরম লক্ষ্যে পৌঁছার জন্যে যে আপ্রাণ চেষ্টা চালাতে হয় সে কর্মপ্রচেষ্টাই উক্ত লক্ষ্যের উপযোগী চরিত্র গঠন করে। ব্যবসায়ী, ডাকাত ও দেশ প্রেমিকরা নিজ নিজ লক্ষ্যে উপনীত হওয়ার জন্য যে পরিশ্রম করে এর ফলে ঐসব উদ্দেশ্যের উপযোগী চরিত্র সৃষ্টি হয়। বিশ্বনবী যে উদ্দেশ্যে কাজ করার জন্য তাঁর অনুসারীদেরকে পরিচালিত করেছেন তাঁদের চরিত্র স্বাভাবিকভাবেই সে উদ্দেশ্যের উপযোগী হিসেবেই তৈরি হতে লাগলো।

ইতিহাসের নযীর

নবী (স) আরব জাতির সম্মুখে জীবনের যে মহান লক্ষ্য তুলে ধরলেন তারই ফলে অসভ্য আরববাসীদের মধ্যে এমন এক মহান চারিত্রিক বিপ্লব সাধিত হলো যার নযীর মানব জাতির ইতিহাসে পাওয়া যায় না। একই দেশে একই সময়ে উচ্চমানের এতগুলো চরিত্রের সমাবেশ মানব সভ্যতার ইতিহাসে এক মহা বিস্ময়। আল্লাহর সন্তুষ্টিই যাঁদের একমাত্র লক্ষ্য তাঁদের কোন সংকীর্ণ স্বার্থ থাকা সম্ভব নয়। ভূগোলের সীমারেখা, রক্ত ও বর্ণের পার্থক্য, ধনী-দরিদ্রের শ্রেণী বিভাগ ইত্যাদির কোনটাই তাঁদের উদ্দেশ্যকে নিয়ন্ত্রিত করতে পারেনি। তাই তাঁদের চারিত্রিক গুণাবলি সর্বত্র একই উন্নতমানের পরিচয় দিয়েছে। ইংরেজ জাতির ন্যায় তাঁদের চরিত্র দেশবাসীর সঙ্গে একরূপ আর বিদেশীদের সঙ্গে অন্যরূপ ছিল না। কারণ তাদের লক্ষ্য সমগ্র মানব জাতির মধ্যে ব্যাপ্ত। একমাত্র আল্লাহর সন্তুষ্টিকে লক্ষ্য করেই তাঁরা কাজ করেছেন। এর চেয়ে মহান কোন লক্ষ্য হতে পারে না বলে তাঁদের চরিত্রের চেয়ে উন্নত কোন চরিত্র সৃষ্টি হওয়াও সম্ভব নয়।

বিজ্ঞানসম্মত সিদ্ধান্ত

বাস্তব অভিজ্ঞতা, ইতিহাসের শিক্ষা ও মনস্তত্ত্বের দিক দিয়ে আমরা এ সিদ্ধান্তে পৌঁছতে বাধ্য যে, আদর্শ প্রতিষ্ঠার সংগ্রামের মধ্য দিয়েই আদর্শের উপযোগী চরিত্র সৃষ্টি হয়। আজ যারা নবীর অনুসারী হওয়ার দাবিদার তাঁদের মধ্যে যারা ইসলামী আদর্শকে বাস্তবে রূপায়িত করার জন্য সংগ্রাম করবেন তাঁদের মধ্যেই ইসলামী চরিত্র সৃষ্টি হওয়া সম্ভব। এ সংগ্রামের ক্ষেত্র যত সংকীর্ণ হবে চরিত্রগুণও সেই পরিমাণেই কম হবে। যারা শুধু ব্যক্তিগত জীবনে ইসলামের আদর্শকে কায়েম করার জন্য সংগ্রাম করবে তারা ঐটুকু ক্ষেত্রেই কিছু পরিমাণ চারিত্রিক গুণের অধিকারী হবে। কিন্তু এটুকু গুণসম্পন্ন লোক সমাজ ও রাষ্ট্রের বৃহত্তর

www.bjilibrary.com

ক্ষেত্রে কোন সুযোগ সুবিধা পেলে ইসলামী চরিত্রের কোন পরিচয় দিতে সক্ষম হবে না। কারণ সমাজ ও রাষ্ট্রীয় পর্যায়ে ইসলামী আদর্শকে প্রতিষ্ঠিত করার সংগ্রাম না করার দরুন ইসলামের সামাজিক ও রাষ্ট্রীয় চরিত্র তাদের মধ্যে বিকাশ লাভ করার সুযোগ পায়নি।

সাহাবায়ে কেরাম (রা) ইসলামী আদর্শকে বাস্তবে প্রতিষ্ঠিত করার জন্য কঠোর সংগ্রাম করেছিলেন। একমাত্র সে কারণেই তাঁদের মধ্যে ইসলামী আদর্শের উপযোগী চরিত্র ও গুণাবলি সৃষ্টি হয়েছিল। তাঁদের সংগ্রামের দুটো দিক রয়েছে। একটি প্রত্যক্ষ ও অপরটি পরোক্ষ। তাদেরকে ইসলামী জ্ঞান অর্জন ও সে জ্ঞান অনুযায়ী জীবন যাপন করতে হয়েছে। তাঁদের চরিত্রকে ইসলামী আদর্শ অনুযায়ী গঠিত করার জন্যে নামায রোযা ইত্যাদির মাধ্যমে প্রত্যক্ষ ট্রেনিং দেওয়ার ব্যবস্থা হয়েছে, কিন্তু শুধু এটুকু বা এ জাতীয় আরও অনেক নফল ইবাদত তাঁদের পূর্ণ ট্রেনিং এর জন্য যথেষ্ট ছিল না। নবী করীম (স) তাদেরকে কুরআন শিক্ষা দিয়েছেন (ইয়াতলূ আলাইহিম আয়াতিহী), কুরআনের ব্যাখ্যা শিখিয়েছেন (ইউ'আল্লিমুহুমুল কিতাব), কুরআন মোতাবেক বাস্তব জীবনের সমস্যার সমাধান দেখিয়েছেন (ওয়াল হিকমাত) এবং ইসলামের বিপরীত যা কিছু তাঁদের জীবনে দেখেছেন তা থেকে তাদেরকে সংশোধন করে দিয়েছেন (ইউযাক্কীহিম)। প্রত্যক্ষভাবে তাদের চরিত্র গঠনে রাসূলুল্লাহ (স) এসব পন্থাই অবলম্বন করেছেন।

কিন্তু পরোক্ষভাবে তাঁদের জীবনে যে সব চরিত্র গুণ সৃষ্টি হয়েছে তা শুধু প্রত্যক্ষ শিক্ষা দ্বারা পূর্ণ হতে পারতো না। ইসলামী আদর্শের বিপরীত শক্তির সাথে লড়াই চলার ফলে তাদের মধ্যে এমন কতক গুণ সৃষ্টি হয়েছিল যা ইসলামী আদর্শকে কায়েম করার জন্য অপরিহার্য ছিল। বিরুদ্ধ শক্তির পক্ষ থেকে যত সব বাধা ও উৎপীড়ন চলেছে তা সবই এক একটি অগ্নি পরীক্ষার সৃষ্টি করেছে। যারা আল্লাহর সন্তুষ্টিকেই লক্ষ্য স্থির করে এ পথে এসেছেন তাদের মধ্যে এর প্রত্যেকটি পরীক্ষাই কতক নতুন চারিত্রিক গুণ সৃষ্টি করে দিয়েছে। এক একটি অগ্নি পরীক্ষায় যারা ব্যর্থ হয় তারা এ সংগ্রামের পথ থেকে আপনিই ছিটকে পড়ে। কিন্তু লক্ষ্য যাদের স্থির রয়েছে তারা প্রতিটি পরীক্ষায়ই উত্তীর্ণ হতে থাকে।

বাধা বিপত্তিকে উপেক্ষা করে যারা এগিয়ে চলে তাদের মধ্যে ধৈর্য, সহিষ্ণুতা, দৃঢ়তা, সততা, ত্যাগস্পৃহা, একনিষ্ঠতা এমনকি জীবন দান করার প্রেরণাও সৃষ্টি হয়। যে পথে এ সংগ্রাম ও সংঘর্ষের বালাই নেই সেখানে জীবন দান করা দূরের কথা সামান্য স্বার্থ ত্যাগেরও কোন ট্রেনিং হয় না।

এজন্যই হিজরতের পূর্বের ও পরের মুসলমানদের চারিত্রিক মান ইসলামী আদর্শের দৃষ্টিতে সমান ছিল না। বিজয় যুগে ইসলামী রাষ্ট্রের নেতৃত্ব ও দায়িত্ব অর্পণ করার ব্যাপারে বদর যুদ্ধে যোগদানকারীদেরকে পরবর্তীদের উপর প্রাধান্য দেওয়া হয়েছে। সংগ্রাম, উৎপীড়ন, নিপীড়ন ও বাধা-বিঘ্ন সত্ত্বেও যারা আদর্শকে কায়েম করার জন্য আন্দোলন বা জেহাদ চালিয়েছেন তাঁদের যে চারিত্রিক উন্নতি সম্ভব ছিল বিজয় যুগে চরিত্র সৃষ্টির সে সুযোগই ছিল না।

www.bjilibrary.com

শেষ কথা

বিশ্বনবী (স) মানব চরিত্র গঠনের যে পদ্ধতি অবলম্বন করেছিলেন তা আল্লাহরই নির্দেশিত পদ্ধতি। এ পথ বিনা সংগ্রামে সস্তা মুক্তির পথ নয়। এ পথে আরাম বিশ্রাম সবই হারাম হয়ে যায়। ইসলামী আদর্শকে দুনিয়ার বুকে কায়েম করার সর্বাত্মক চেষ্টা ও আন্দোলনের মাধ্যমে আল্লাহর সন্তুষ্টি লাভ জীবনের উদ্দেশ্য বলে যারা গ্রহণ করে তারাই এ পথের পথিক। তাদের চরিত্র এ আন্দোলনের মাধ্যমেই গড়ে উঠে। চরিত্র গঠনের এ পদ্ধতিটিই একমাত্র বিশুদ্ধ ও স্বাভাবিক। জীবনের এ লক্ষ্যটুকুতে কোনরূপ ভ্রান্তি থাকলেই সে অনুপাতে চরিত্র গঠন পদ্ধতিতে এবং চরিত্রে ত্রুটি থেকে যাবে।

বহু দীনদার লোকেরও ইকামতে দীনের সংগ্রামী পথটুকু বুঝে আসে না। ফলে তাঁরা এমন সব কৃত্রিম পদ্ধতি অবলম্বন করে যাতে কোনক্রমেই বলিষ্ঠ চরিত্র সৃষ্টি হয় না। আন্তরিকতাসম্পন্ন মুসলমানদের মধ্যেও আজ যে চারিত্রিক বৈষম্য দেখা যায় এর মূল কারণ চরিত্র গঠন পদ্ধতির পার্থক্য। আর এ পার্থক্যের ভিত্তি হলো দীনকে কায়েম করার সংগ্রামী পথ থেকে বিচ্যুতি। কুরআন ও হাদীসের পরিভাষায় এ সংগ্রামী পথই হলো আল্লাহর পথে জিহাদ। বাংলায় এর সঠিক তরজমা হতে পারে ইসলামী আন্দোলন। আন্দোলনের এ বিপ্লবী পথ ছাড়া আল্লাহর সন্তুষ্টির উদ্দেশ্যে যত কিছুই করা হোক এবং যত এখলাসের সাথেই করা হোক তাতে ইসলামের প্রচার নিশ্চয়ই হবে, কিন্তু ইসলামকে কায়েম করা সম্ভব হবে না। ইকামতে দীন বা ইসলামকে কায়েম করার জন্য ইশায়াতে দীন তথা ইসলামের প্রচার অত্যাবশ্যক। কিন্তু শুধু প্রচার দ্বারা জিহাদ হয়ে যায় না বলেই দীন কায়েম করার উপযোগী চরিত্র সৃষ্টি হয় না।

ইসলামকে পূর্ণরূপে কায়েম করার আন্দোলন ব্যতীত দীনী ইলমের প্রচার এবং ইসলামী চরিত্র সৃষ্টির উদ্দেশ্যে আন্তরিকতার সাথে চেষ্টা করলেও ঐরূপ মুজাহেদানা বিপ্লবী চরিত্র সৃষ্টি হবে না, যেরূপ চরিত্র ইসলামকে কায়েম করার জন্যে আবশ্যক। সুতরাং ইসলামকে যাঁরা আদর্শ হিসেবে গ্রহণ করেন তাঁদেরকে রাসূলুল্লাহ (স)-এর চরিত্র গঠন পদ্ধতিই গ্রহণ করা কর্তব্য।

www.bjilibrary.com

বিশ্বনবীর জীবনে রাজনীতি

রাসূলুল্লাহ (স)-এর জীবনী এমন এক মহাসমুদ্র যে, লক্ষ লক্ষ লোকের আলোচনা সত্ত্বেও আজ পর্যন্ত এর কোন কুল-কিনারা পাওয়া যায়নি। তাই এই মহামানবের জীবনের শিক্ষা ও আদর্শ সম্পর্কে এবং তাঁর জীবনের বিভিন্ন দিক ও ঘটনা সম্বন্ধে এত গবেষণা হওয়ার পরও যেন অনেকেরই নতুন কোন কথা বলার থাকে।

হযরত আয়েশা (রা)-এর একটি ছোট মন্তব্য নবী করীম (স)-এর জীবনের বিশালতা সম্বন্ধে স্পষ্ট ইঙ্গিত দান করে। নবী চরিত্র সম্পর্কে জিজ্ঞাসিত হয়ে নবীর জীবন সঙ্গিনী হিসেবে তিনি জওয়াব দিলেন ঃ كَانَ خُلُقُهُ الْقُرْاٰنُ "কুরআনই তার চরিত্র"। প্রকৃত কথাও এই যে, কিতাব আকারে আমরা কুরআন নামক যে গ্রন্থখানা পাঠ করি এটা কিতাবী কুরআন মাত্র। আসল কুরআনই হলো নবীর জীবন। রাসূলে পাকের জীবনে কুরআনের যে বাস্তব রূপ পাওয়া যায় তা থেকেই কুরআনের আসল পরিচয় মিলে। সুতরাং নবীজীবন থেকে বিচ্ছিন্ন দৃষ্টি নিয়ে যদি কেউ কুরআন মজীদকে বুঝবার চেষ্টা করে তাহলে হয় কুরআন তার নিকট এক অর্থহীন গ্রন্থ বলে মনে হবে, আর না হয় পাঠক কুরআনের মনগড়া অর্থই করবে। নবীর জীবনে যারা কুরআনের বাস্তব অর্থ তালাশ করে না, কুরআন বুঝবার সব দুয়ারই তাদের নিকট রুদ্ধ। রাসূলের বাস্তব জীবনের সাহায্যে যেমন কুরআন বুঝতে হবে, তেমনি রাসূলের জীবনকেও কুরআনের আলোতেই দেখতে হবে।

এ দৃষ্টিভঙ্গীতে বিচার করলে নবীজীবন কুরআনের মতই ব্যাপক ও বিশাল। কুরআন পাককে যেমন ব্যাখ্যা করে শেষ করার উপায় নেই, রাসূলের জীবনী আলোচনা করার ব্যাপারেও কারও পক্ষে চূড়ান্ত কথা বলার ক্ষমতা নেই। চিরদিনই মানুষ এ মহামানবের জীবনসমুদ্র থেকে প্রয়োজন পরিমাণ শিক্ষা ও উপদেশ গ্রহণ করবে। এমনকি তাঁর এক একটি কথা ও ঘটনা থেকে অগণিত আলো বিচ্ছুরিত হবে। কোন দিনই এ মহাসাগরের অথৈ পানি নিঃশেষ হবে না।

আলোচ্য বিষয়

রাসূলুল্লাহ (স)-এর বিশাল জীবনের একটি গুরুত্বপূর্ণ দিক সম্বন্ধে একটি মাত্র দৃষ্টিকোণ থেকে আমরা এখানে আলোচনা করতে চাই। তাঁর রাজনৈতিক জীবনকে বিভিন্ন দৃষ্টিকোণ থেকে দেখা যেতে পারে। একটি আদর্শকে বাস্তবে রূপায়িত করার জন্য তাঁর আন্দোলনে যে রাজনৈতিক প্রজ্ঞা ও দূরদর্শিতার পরিচয় পাওয়া যায় সে বিষয়ে বহু যোগ্য লেখক দীর্ঘ আলোচনা করেছেন। রাষ্ট্রনায়ক হিসেবে তিনি বিভিন্ন মত ও পথের লোকদের নিয়ে যেরূপ শান্তিপূর্ণ সমাজ প্রতিষ্ঠা করেছিলেন সে দিকটিও দুনিয়ার মানুষকে চিরদিনই অনুসরণের প্রেরণা দিতে থাকবে। এভাবে তাঁর রাজনৈতিক জীবনের অনেক দিকই আলোচনার জন্য নিশ্চয়ই মূল্যবান বলে বিবেচিত হবে। কিন্তু আমরা সব দিক দিয়ে রাসূলুল্লাহ (স)-এর রাজনৈতিক জীবন সম্বন্ধে এখানে আলোচনা করব না।

www.bjilibrary.com

আমাদের মূল আলোচ্য বিষয় হলো 'বিশ্বনবীর জীবনে রাজনীতি'। নবী করীম (স) কি শুধু একজন ধর্মীয় নেতা মাত্র ছিলেন? না তাঁর জীবনে রাজনীতিও ছিল, এখানে সে বিষয়েই আমরা আলোচনা করব। রাজনীতিকে তিনি জীবনে কতটুকু স্থান দিয়েছিলেন, আল্লাহ্ পাক তাঁকে রাজনৈতিক কার্যকলাপের নির্দেশ দিয়েছিলেন কিনা, সমসাময়িক রাজনীতিকদের সাথে তাঁর সংঘর্ষ বাধার কি কারণই বা ছিল—একমাত্র এ দৃষ্টিকোণ থেকেই আমরা রাসূলুল্লাহ (স)-এর রাজনৈতিক জীবন সম্পর্কে আলোচনা করতে চাই।

আলোচ্য বিষয়ের গুরুত্ব

রাসূলুল্লাহ (স)-এর জীবনে রাজনীতির স্থান সম্বন্ধে আলোচনা করা আজ নানা কারণে অত্যন্ত জরুরী হয়ে পড়েছে। দীর্ঘ পরাধীনতার পরিণামে ধার্মিকদের মধ্যেও আজ এমন লোক সৃষ্টি হয়েছেন, যারা দীনদার ও পরহেজগার বলে সমাজে পরিচিত হওয়া সত্ত্বেও 'রাজনীতি' করাকে নিন্দনীয় মনে করেন, অথবা অন্তত পক্ষে অপছন্দ করেন। তাঁরা দেশের রাজনীতি থেকে পরহেয করাকে (নিজেদেরকে নিরাপদ দূরত্বে সরিয়ে রাখাকে) দীনদারী ও তাক্ওয়ার জন্য জরুরী মনে করেন। আবার আর এক শ্রেণীর লোক পাশ্চাত্য চিন্তাধারা, মতবাদ ও জীবন দর্শনের অনুসারী হওয়ার ফলে ইসলামকেও খ্রিস্টধর্মের ন্যায় এক অনুষ্ঠান সর্বস্ব পূজা-পার্বণ বিশিষ্ট ধর্মমত বলে মনে করেন। তাঁদের ঈমান মোতাবেক ধর্ম ও রাজনীতি সম্পূর্ণ পৃথক। খ্রিস্টধর্ম-যাজকদের সাথে জ্ঞান বিজ্ঞানের সাধকদের আড়াই শত বছরের দীর্ঘ রক্তক্ষয়ী সংগ্রামের পর ইউরোপ ধর্মনিরপেক্ষতাবাদকে মতবাদ হিসেবে গ্রহণ করে। ইউরোপের পদানত থাকা অবস্থায় প্রায় সকল মুসলিম দেশেই সে মতাদর্শ প্রতিষ্ঠিত হয়।

ইসলামের সঠিক জ্ঞান থেকে বঞ্চিত থাকা অবস্থায় যেসব মুসলিম পাশ্চাত্যের শিক্ষা ও জীবন দর্শনে দীক্ষা গ্রহণ করেছেন, প্রধানত তারাই আজ স্বাধীন মুসলিম দেশগুলোর পরিচালক। ইসলামকে পূর্ণাংগ জীবন বিধান হিসেবে সমাজ ও রাষ্ট্রে প্রতিষ্ঠা করার উদ্দেশ্যে বিভিন্ন মুসলিম রাষ্ট্রে যে ক'টি ইসলামী আন্দোলন দানা বেঁধে উঠেছে এর প্রত্যেকটিই ধর্মনিরপেক্ষতাবাদী শাসক গোষ্ঠীর গাত্রদাহ সৃষ্টি করেছে। তারা ইসলামকে খ্রিস্টধর্মের মতই শুধু ব্যক্তিগত জীবনে পালনযোগ্য একটি ধর্মে পরিণত করতে ব্যস্ত হয়ে উঠেছেন এবং রাজনীতির বিশাল ক্ষেত্রটিকে ধর্মের আওতা থেকে পৃথক করার পরিকল্পনায় মেতেছেন।

এভাবে কতক ধার্মিক রাসূলের সংগ্রামী জীবনের দিকে লক্ষ্য না করে তাঁকে এমনভাবে চিত্রিত করেন যেন আল্লাহর নবী সংসারত্যাগী কোন বৈরাগী ছিলেন (নাউযুবিল্লাহ)। ওদিকে মুসলিম নামধারী শাসকেরাও রাসূলকে শুধু ধর্মীয় নেতা হিসেবেই স্বীকার (গ্রহণ নয়) করতে প্রস্তুত। মহানবীর সামগ্রিক জীবনকে একক ও সে পূর্ণাঙ্গ সত্তা হিসেবে গ্রহণ না করার মনোভাবটি উদ্দেশ্যমূলক হলেও সরল মুসলমান এদের দ্বারা বিভ্রান্ত হয়ে থাকে।

বিশেষ করে ধর্মীয় ও সমাজসেবামূলক বহু প্রতিষ্ঠান রাজনীতি থেকে দূরে থেকে ইসলামের নামে আন্তরিকতার সাথে খেদমত করছেন বলে উপর্যুক্ত স্বার্থপর লোকেরা ইসলামকে নিয়ে রাজনীতি না করার পক্ষে ঐসব প্রতিষ্ঠানের নযীর পেশ করেন। তাদের

www.bjilibrary.com

মতে দুনিয়ার সব মত ও পথ নিয়ে রাজনীতি করা জায়েয হলেও ইসলামী আদর্শকে নিয়ে রাজনীতির ক্ষেত্রে অবতীর্ণ হওয়া একেবারেই অন্যায়। এসব ভ্রান্ত ধারণা দূর করার উদ্দেশ্যেই 'বিশ্বনবীর জীবনে রাজনীতি' ছিল কিনা এবং ইসলামে রাজনীতি জরুরী কিনা তা আলোচনা করা প্রয়োজন।

রাজনীতির অর্থ কি?

রাজার নীতিকেই হয়তো একসময় রাজনীতি বলা হতো। আসলে রাষ্ট্র পরিচালনা সংক্রান্ত নীতিই রাজনীতি বা রাষ্ট্রনীতি বলে পরিচিত। অবশ্য রাষ্ট্রনীতি ও রাজনীতি পরিভাষা হিসেবে বর্তমানে এক কথা নয়। রাষ্ট্র ও সরকারের যেরূপ পার্থক্য, রাষ্ট্রনীতি ও রাজনীতিতে তেমনি তফাত। অর্থাৎ রাষ্ট্র সংক্রান্ত বিষয়াদি হলো রাষ্ট্র নীতির অন্তর্ভুক্ত আর সরকার সম্বন্ধীয় কার্যকলাপকেই বলা হয় রাজনীতি।

রাজনৈতিক কার্যকলাপ

সরকারি ক্ষমতা যাদের হাতে থাকে তাদেরকে সংশোধন করা, তাদের কার্যাবলির সমালোচনা করা, সরকারি নীতির ভ্রান্তি প্রকাশ করে জনগণকে সচেতন করা এবং এ জাতীয় যাবতীয় কাজকেই রাজনৈতিক কার্যাবলি হিসেবে গণ্য করা হয়। কিন্তু সরকার পরিবর্তনের প্রচেষ্টাই হলো সবচেয়ে বড় রাজনৈতিক কার্য। ভ্রান্ত নীতি ও আদর্শে রাষ্ট্র পরিচালিত হতে দেখে সরকারি কর্তৃপক্ষকে ক্ষমতাচ্যুত করে সঠিক শাসন ব্যবস্থা চালু করতে চেষ্টা করাই প্রধান রাজনৈতিক কার্যকলাপ।

বিশ্বনবীর দায়িত্ব

এখন দেখা যাক, আল্লাহ পাক হযরত মুহাম্মদ (স)-কে যে বিরাট দায়িত্বসহ পাঠিয়েছিলেন তা পালন করতে গিয়ে তাঁকে রাজনৈতিক কাজ করতে হয়েছিল কিনা। যদি তিনি নবী হিসেবে রাজনৈতিক কার্যকলাপে লিপ্ত হয়েছিলেন বলে জানা যায়, তাহলে রাজনীতি করা ইসলামের তাগিদই মনে করতে হবে। নবী বলে ঘোষিত হবার পর থেকে তাঁর গোটা জীবনই যদি আমাদের জন্য আদর্শ হিসাবে বিবেচিত হয় তাহলে তাঁর রাজনৈতিক কাজগুলো অনুসরণের অযোগ্য হবার কী কারণ থাকতে পারে? হযরতের উপর কী দায়িত্ব অর্পিত হয়েছিল এবং তিনি কিভাবে তা পালন করেছিলেন তা আলোচনা করলেই বিশ্বনবীর জীবনে রাজনীতি কতটা ছিল সে কথা স্পষ্টরূপে প্রকাশ পাবে।

আল্লাহ পাক তাঁর রাসূলকে কোন্ কর্তব্য দিয়ে পাঠিয়েছিলেন কুরআন মজীদের বহুস্থানে বিভিন্নভাবে স্বয়ং আল্লাহ তাআলা তা সুস্পষ্ট ভাষায় ঘোষণা করেছেন। আল্লাহ বলেন ঃ

هُوَ الَّذِىْ اَرْسَلَ رَسُوْلَهُ بِالْهُدٰى وَدِيْنِ الْحَقِّ لِيُظْهِرَهُ عَلَى الدِّيْنِ كُلِّهِ، وَكَفٰى بِاللّٰهِ شَهِيْدًا ـ

"তিনিই ঐ সত্তা যিনি তাঁর রাসূলকে হেদায়াত ও দীনে হকসহ পাঠিয়েছেন, যাতে আর সব দীনের উপর একে (দীনে হককে) বিজয়ী করে তুলেন। এ বিষয়ে আল্লাহ তাআলাই সাক্ষী হিসেবে যথেষ্ট।" (আল ফাতহু ঃ ২৮)

এ আয়াতের শেষ অংশটুকু অত্যন্ত তাৎপর্যপূর্ণ। আল্লাহ তাঁর রাসূলকে প্রধানত কোন্ কাজ করার দায়িত্ব দিয়েছিলেন সে সম্পর্কে আল্লাহর চেয়ে বেশি কারও পক্ষে জানবার উপায় নেই। সুতরাং সে বিষয়ে অন্য কারও সাক্ষ্যই গ্রাহ্য নয়—আল্লাহর সাক্ষ্যই সেখানে যথেষ্ট।

www.bjilibrary.com

রাসূলুল্লাহ (স)-এর জীবনকে বিভিন্ন দিক থেকে বিচার করে কোন একটি দিক বা বিভাগকে নিজেদের রুচিমত প্রধান দিক বলে সাব্যস্ত করতে গিয়ে অনেক বিভ্রান্তির সৃষ্টি করা হয়েছে। সাত অন্ধের হাতি দেখার ন্যায়, কেউ তাঁর বিশাল জীবনের এক অংশ থেকে শুধু হেরা গুহায় ধ্যান মগ্ন দিকটিকেই প্রধান বলে গ্রহণ করেছেন। কেউ তাঁর নামায-রোযা, তাসবীহ-তেলাওয়াত ও তাহাজ্জুদের দিকটাকেই প্রধান বলে গ্রহণ করেছেন। কেউবা তাঁকে একজন 'আরব জাতীয়তাবাদী' নেতা হিসেবেই দেখেছেন। আর কেউ শুধু সর্বহারাদের নেতা হিসেবে চিত্রিত করে নিজ নিজ মত ও পথের সমর্থনে রাসূলকে দলীল হিসেবে পেশ করার চেষ্টা করেছেন।

এ জাতীয় সবাই রাসূলের গোটা জীবনধারাকে এক সাথে বিবেচনা করে রাসূলের জীবনের মূল লক্ষ্যটুকুকে বুঝতে সক্ষম হননি। তাঁরা অন্ধের মতোই হাতড়িয়ে যেটুকু দেখতে পেয়েছেন সেটুকুই রাসূলের গোটা জীবন বলে ধারণা করেছেন। এদের অনেকেই হয়ত সাত অন্ধের ন্যায় আন্তরিকতার সাথেই নিজ নিজ সিদ্ধান্তে পৌঁছেছেন। কিন্তু আল্লাহ স্বয়ং রাসূলকে যে উদ্দেশ্যে পাঠিয়েছেন বলে ঘোষণা করেছেন তার সাথে এঁদের ধারণার কোন মিল নেই।

হেরা গুহায় হযরতের ধ্যানমগ্ন থাকা, নামায রোযায় মশগুল হওয়া, শেষ রাতে তাহাজ্জুদে নিমগ্ন হওয়া এবং সর্বহারাদের দুর্গতি দূর করার চেষ্টা চালানো—এ সবই তাঁর জীবনে লক্ষ্য করা যায় সত্য। এগুলো তাঁর কর্মবহুল জীবনের বিভিন্ন ঘটনা হলেও এর কোনটাই বিচ্ছিন্ন নয়। এ সবই হযরতের জীবনের মূল দায়িত্বের সাথে সংশ্লিষ্ট এবং তাঁর মূল লক্ষ্যে পৌঁছার উপযোগী। কিন্তু ঐ সব কাজের কোনটাই রাসূলকে পাঠাবার প্রধান উদ্দেশ্য নয়।

রাসূলের প্রাধন দায়িত্ব

পূর্বোল্লিখিত আয়াতে আল্লাহ পাক তাঁর রাসূলকে পাঠাবার যে উদ্দেশ্য বর্ণনা করেছেন সেটাই নবীজীবনের প্রধান দায়িত্ব। উক্ত আয়াতে বলা হয়েছে যে, রাসূলকে একমাত্র দীনে হক দিয়ে দুনিয়ায় পাঠানো হয়েছে এবং মানব রচিত যাবতীয় দীনের উপর আল্লাহর দীনকে বিজয়ী করে দেবার উদ্দেশ্যে তাঁকে দায়িত্ব দেওয়া হয়েছে। এতে স্পষ্টই বুঝা গেল যে, রাসূলকে শুধু একজন প্রচারক অথবা ধর্মনেতার দায়িত্ব দেওয়া হয়নি। দীন ইসলামরূপ পূর্ণাঙ্গ জীবন বিধানটিকে একটি বিজয়ী আদর্শ হিসেবে প্রতিষ্ঠা করাই হযরতের প্রধান দায়িত্ব ছিল। দীন ইসলাম মানব সমাজে বাস্তবে প্রতিষ্ঠা করাই নবীজীবনের মূল লক্ষ্য ছিল। তিনি যখন যা করেছেন একমাত্র সে লক্ষ্যে পৌঁছার জন্যেই করেছেন এবং সে চরম লক্ষ্যে পৌঁছবার উদ্দেশ্যেই একটি বিপ্লবী আন্দোলন পরিচালনা করেছেন।

রাসূলের বিপ্লবী আন্দোলন

মানব সমাজে কোন না কোন ব্যবস্থা কায়েম থাকেই। সামাজিক রীতি-নীতি, আইন, শাসন, বিচার, অর্থনৈতিক ব্যবস্থা, ধর্মীয় প্রথা ইত্যাদি সমাজে প্রচলিত থাকে। যে সমাজব্যবস্থা পূর্ব থেকেই প্রতিষ্ঠিত থাকে তা যেমন আপনিই কায়েম থাকে না তেমনি তা আপনা আপনিই উৎখাতও হয় না। রাজনৈতিক, সামাজিক, অর্থনৈতিক ও ধর্মীয় নেতৃত্বই প্রচলিত সমাজব্যবস্থাকে কায়েম রাখে। যখনই কেউ এ ব্যবস্থাকে উৎখাত করার আওয়ায তোলে তখনই সর্বশ্রেণীর নেতৃত্ব একজোট হয়ে এর বিরোধিতা করে। কারণ এ সব নেতৃত্বের স্বার্থ প্রচলিত সমাজব্যবস্থায়ই কায়েম থাকা সম্ভব। এগুলোই সমাজের কায়েমী

www.bjilibrary.com

স্বার্থ (VESTED INTEREST)। প্রতিষ্ঠিত সমাজব্যবস্থাকে উৎখাত করার জন্য যখনই কোন প্রচেষ্টা চলে তখনই কায়েমী নেতৃত্বের সাথে সংঘর্ষ বাধে। ধর্মীয় ও সামাজিক রীতি-নীতি, আইন ও শাসন এবং অর্থনৈতিক কাঠামো মিলে যে সমাজব্যবস্থা প্রতিষ্ঠিত থাকে তাকে সম্পূর্ণরূপে পরিবর্তন করে নতুন ধরনের নীতি ও আদর্শে সমাজকে গঠন করার আওয়ায উঠবার সঙ্গে সঙ্গেই কায়েমী নেতৃত্ব চঞ্চল হয়ে উঠে এবং এ আওয়াযকে বন্ধ করার জন্য সর্বশক্তি প্রয়োগ করে।

সমাজে এ ধরনের ব্যাপক পরিবর্তন আনয়ন করাকে বিপ্লব বলে। সমাজব্যবস্থার পরিবর্তন ব্যতীত সরকারের উত্থান-পতন বা দল বিশেষের নাটকীয় ক্ষমতা দখলকে বিপ্লব নাম দিলেও তাকে প্রকৃত বিপ্লব বলা চলে না। গোটা সমাজের মৌলিক ও ব্যাপক পরিবর্তনকেই বিপ্লব বলে। এ ধরনের বৈপ্লবিক পরিবর্তনের জন্য যে আন্দোলন প্রয়োজন তারই নাম বিপ্লবী আন্দোলন।

রাসূলুল্লাহ (স) আরব ভূমিতে যে ব্যাপক বিপ্লব সৃষ্টি করেছিলেন তা হঠাৎ সংঘটিত হয়নি। আরবের প্রচলিত সমাজ ব্যবস্থাকে সম্পূর্ণরূপে বদলিয়ে দেওয়ার জন্য রাসূলকে কালেমায়ে তাইয়েবার ভিত্তিতে এক বিপ্লবী আন্দোলন শুরু করতে হয় এবং দীর্ঘ ২৩ বছরের অবিরাম চেষ্টায় সে বিপ্লব সফল হয়।

দুনিয়ার ইতিহাসে এরূপ কোন নযীর পাওয়া যায় না যে, কায়েমী নেতৃত্ব কোন বিপ্লবী আওয়ায শুনেই নতুন সমাজব্যবস্থা গড়বার জন্য খুশি হয়ে নেতৃত্বের আসন ত্যাগ করে সরে দাঁড়িয়েছে। বরং সব সমাজে সব কালেই দেখা গিয়েছে যে, কায়েমী নেতৃত্বের অধিকারীরা শেষ মুহূর্ত পর্যন্ত ক্ষমতা আঁকড়িয়ে থাকারই চেষ্টা করেছে এবং বিপ্লবী আন্দোলন ক্রমে ক্রমে শক্তি সঞ্চয় করে তাদেরকে উৎখাত করেছে।

রাসূলুল্লাহ (স)-এর বেলায়ও এর ব্যতিক্রম হয়নি। ইসলামী আদর্শে সমাজব্যবস্থাকে গড়ে তুলবার যে দায়িত্ব তাঁর উপর ন্যস্ত ছিল, তা পালন করার প্রথম পদক্ষেপেই মক্কার নেতৃত্ব অস্থির হয়ে উঠলো। পয়লা লোভ দেখিয়ে তাঁকে এ পথ থেকে নিবৃত্ত করতে চেষ্টা করলো। কালেমায়ে তাইয়েবার বিপ্লবী দাওয়াত থেকেই সমাজের কায়েমী স্বার্থের অধিকারীরা বুঝতে পারলো যে, এ আওয়ায তাদের বিরুদ্ধেই স্পষ্ট বিদ্রোহ। নেতৃত্বের লোভ, অর্থ সম্পদ, নারীর লালসা ইত্যাদির (যা তাদের জীবনের চরম লক্ষ্য) বিনিময়ে তারা হযরতকে এ পথ থেকে ফিরাবার চেষ্টা করলো। হযরত সে প্রস্তাব গ্রহণ করতে রাজি হলে তাদের প্রচলিত সমাজব্যবস্থাকেও মেনে নিতে বাধ্য হতেন।

কিন্তু আদর্শভিত্তিক আন্দোলন যারা করেন তাঁদের পক্ষে এ ধরনের প্রস্তাবে রাজি হওয়া সম্ভবই নয়। তাই এ ধরনের আন্দোলনের সাথে প্রতিষ্ঠিত নেতৃত্বের সংঘর্ষ অনিবার্য। দীর্ঘ ও কঠোর সংগ্রামের পর নবী করীম (স) বিজয়ী হন এবং ইসলামী আদর্শে সমাজব্যবস্থাকে গড়ে তুলতে সক্ষম হন।

ইসলামী আন্দোলন ও রাজনীতি

অনৈসলামী সমাজব্যবস্থাকে পরিবর্তন করে ইসলামী আদর্শের ভিত্তিতে মানব সমাজকে পুনর্গঠনের উদ্দেশ্যে আল্লাহর নবী যে আন্দোলন পরিচালনা করেন তাই হলো আদর্শ ইসলামী আন্দোলন। এ ধরনের আন্দোলন রাজনৈতিক কার্যকলাপ ব্যতীত কী করে সম্ভব হতে পারে? সমাজবিজ্ঞান, রাষ্ট্রব্যবস্থা ও আদর্শবাদী আন্দোলনের ইতিহাস যারা কিছুটা চর্চা

www.bjilibrary.com

করেন এবং মানব সমাজের সমস্যা নিয়ে যারা একটু চিন্তা-ভাবনা করেন তাদের পক্ষে এ কথা বুঝা অত্যন্ত সহজ। যারা স্থূল দৃষ্টিতে ইসলামকে দেখেন তারা এটাকে একটা ধর্ম মাত্র মনে করে রাজনীতিকে ইসলাম থেকে আলাদা করতে চান। তারা হয় আন্দোলনের অর্থই বুঝেন না, আর না হয় আন্দোলনের সংগ্রামী পথে চলার সাহস রাখেন না। ইসলামকে একটা জীবন বিধান হিসেবে বুঝে যারা রাজনীতি করা পছন্দ করেন না, তারা নিশ্চয়ই পার্থিব কোন স্বার্থের খাতিরে অথবা কায়েমী নেতৃত্বের নির্যাতন থেকে আত্মরক্ষা করার জন্য এরূপ নিষ্ক্রিয় পন্থা অবলম্বন করেন।

নবী করীম (স) যে আন্দোলন চালিয়েছিলেন তাতে প্রকৃতপক্ষে চরম রাজনৈতিক কার্যকলাপ অপরিহার্য ছিল। দেশের নেতৃত্ব যদি অনৈসলামিক লোকদের হাতে থাকে, তাহলে ইসলাম একটি বিজয়ী আদর্শ হিসেবে কিছুতেই প্রতিষ্ঠিত হবার সুযোগ পেতে পারে না। তাই ইসলামী আদর্শের বিজয় মানেই নেতৃত্বের পরিবর্তন এবং নেতৃত্ব পরিবর্তনের প্রচেষ্টাই চরম রাজনীতি। রাজনীতি করাকে যারা দীনদারীর খেলাফ মনে করেন তাঁরা রাসূলুল্লাহ (স)-এর এ চরম রাজনীতিকে কিভাবে ব্যাখ্যা করবেন? যারা এ নীতি অবলম্বন করেন তারা কি নিজেদেরকে রাসূলের চেয়েও বেশি দীনদার বলে মনে করেন? তা নিশ্চয়ই তাঁরা করেন না। প্রকৃতপক্ষে তারা রাজনীতির অর্থই বুঝেন না এবং দীনের দাবি সম্পর্কেও পূর্ণ চেতনা রাখেন না।

রাসূলের রাজনীতির বৈশিষ্ট্য

আজকাল রাজনীতি করাকে যে কারণে নেক লোকেরা ঘৃণা করেন তা অত্যন্ত স্পষ্ট। পাশ্চাত্য গণতন্ত্রের অনুকরণে বিভিন্ন মুসলিম দেশে যে রাজনীতির প্রচলন হয়েছে তা কোন ভদ্রলোকের পক্ষেই পছন্দ করা সম্ভব নয়। ব্যক্তি ও দলীয় স্বার্থকে আদর্শ হিসেবে গ্রহণ করে ক্ষমতা দখলের জঘন্য কোন্দলই এক শ্রেণীর লোকের নিকট রাজনীতি হয়ে দাঁড়িয়েছে। কেউ টাকার জোরে, কেউ ভোটের বলে, আর কেউ অস্ত্রের দাপটে ক্ষমতা দখল করতে সর্বপ্রকার অন্যায় পন্থা অবলম্বন করে রাজনীতি করে থাকেন। এসব লোক জঘন্য রাজনৈতিক কার্যকলাপের মাধ্যমে গদি দখল করার পর তাদের বিরুদ্ধে সমালোচনার অধিকারটুকুও হরণ করে থাকে। নীতি ও আদর্শের ভিত্তিতে জাতিগঠনের প্রচেষ্টাকেও এরা রাজনৈতিক কার্যকলাপ বলে দমন করতে চান।

শেষ নবীর ইসলামী আন্দোলনকেও এ মনোভাব নিয়েই দমন করার চেষ্টা চলেছিল। শুধু শেষ নবীই নয়, হযরত ইব্রাহীম (আ), হযরত মূসা (আ) ও অন্যান্য নবীর আন্দোলনের সাথেও একই ব্যবহার করা হয়েছে। কেননা নবীদের আন্দোলনের পরিণতি যে নেতৃত্বের পরিবর্তন সে কথা ক্ষমতাসীনদের বুঝতে বাকী ছিল না।

কিন্তু নবীদের রাজনীতির প্রধান বৈশিষ্ট্য হলো, তাঁদের চারিত্রিক ও নৈতিক শক্তি। বিপ্লবী আন্দোলন শুরু করার পূর্বে নবীদের নিষ্কলঙ্ক দীর্ঘজীবন যে নিঃস্বার্থপরতার পরিচয় বহন করে তা ইসলাম ব্যতীত আর কোন আদর্শবাদী আন্দোলনে সমপরিমাণে পাওয়া যায় না। সমাজে এ নৈতিক প্রতিষ্ঠাই তাঁদের আন্দোলনের প্রধান মূলধন। শেষ নবীর রাজনীতিতে

www.bjilibrary.com

এ নিঃস্বার্থপরতা ও নৈতিকতার বৈশিষ্ট্য সমুজ্জ্বল ছিল। এজন্যই তাঁর বিরুদ্ধে কোন সস্তা শ্লোগান কার্যকরী হয়নি। তাঁর নিঃস্বার্থ চরিত্রের প্রভাবকে শুধু রাজনৈতিক কার্যকলাপের দোহাই দিয়ে প্রতিরোধ করা সম্ভব ছিল না।

হযরতের রাজনীতির দ্বিতীয় বৈশিষ্ট্য হলো, উপায় উপকরণের পবিত্রতা। তিনি কোন অন্যায় ও বিশৃঙ্খলা সৃষ্টিকারী পন্থা অবলম্বন করে রাজনীতি করেননি। তাঁর রাজনৈতিক দুশমনদের সাথে তিনি ব্যক্তিগত আক্রোশও পোষণ করতেন না। কঠিন রাজনৈতিক শত্রুও যদি ইসলামের আদর্শ গ্রহণ করে তাঁর নেতৃত্ব মেনে নিতে রাজি হতো তাহলে তিনি পূর্বের সব দোষ মাফ করে দিতেন।

তাঁর রাজনীতির তৃতীয় বৈশিষ্ট্য হলো, উদ্দেশ্যের পবিত্রতা। ইসলামের নেতৃত্ব প্রতিষ্ঠাই তাঁর কাম্য ছিল। ব্যক্তি প্রতিষ্ঠা যদি তাঁর উদ্দেশ্য হতো তাহলে আন্দোলনের শুরুতেই তিনি মক্কার নেতৃত্বের প্রস্তাব মেনে নিয়ে বাদশাহ হতে পারতেন।

চারিত্রিক পবিত্রতা, উপায় ও পন্থার পবিত্রতা এবং উদ্দেশ্যের পবিত্রতা—এ তিনটি মৌলিক বৈশিষ্ট্যই রাসূলের রাজনীতিকে স্বার্থপর ও দুনিয়াদারদের রাজনীতি থেকে পৃথক মর্যাদা দান করেছে। যদি কেউ ইসলামী রাজনীতি করতে চায় তাহলে তাকে মহানবীর এ তিনটি রাজনৈতিক বৈশিষ্ট্যকে মূলধন হিসেবে গ্রহণ করতেই হবে। যাদের চরিত্র, কর্মপন্থা ও উদ্দেশ্য অপবিত্র বলে বুঝা যায়, তারাও যদি ইসলামের নামে রাজনীতি করে তা হলে ইসলামের উপকারের চাইতে অপকারই বেশি হয়। এদের রাজনীতির সাথে রাসূলের রাজনীতির কোন সম্পর্ক নেই। বরং এদের রাজনীতি অন্যান্য স্বার্থবাদী রাজনীতির চেয়েও জঘন্য।

কায়েমী নেতৃত্ব পরিবর্তনে রাসূলের কর্মপন্থা

কোন নবীই প্রচলিত নেতা বা শাসকদের নিকট নেতৃত্বের গদি দাবি করেননি। হযরত ইব্রাহীম (আ) নমরূদের নিকট, হযরত মূসা (আ) ফেরাউনের নিকট এবং শেষ নবী মক্কা ও অন্যান্য স্থানের নেতৃবৃন্দ ও শাসকদের নিকট ইসলামের দাওয়াতই পেশ করেছেন; তাদেরকে গদি পরিত্যাগ করার আহ্বান জানাননি। তবু প্রত্যেক রাসূলের সঙ্গেই কায়েমী নেতৃত্বের সংঘর্ষ বেধেছে। সমাজের সর্ব শ্রেণীর লোকই রাসূলগণকে সকল দিক দিয়েই আদর্শস্থানীয় বলে স্বীকার করা সত্ত্বেও ইসলামের আহ্বান জানানোর পর সকল কায়েমী স্বার্থই যুক্তফ্রন্ট করে তাঁদের বিরোধিতা করেছে।

প্রচলিত সমাজের নেতৃবৃন্দ কোনকালেই ইসলামের আহ্বান গ্রহণ করতে রাজি হয়নি। কেননা, তাদের পার্থিব যাবতীয় স্বার্থ প্রতিষ্ঠিত সমাজ ব্যবস্থার মধ্যেই নিহিত ছিল। তবু নবীগণ ইসলামের দাওয়াত সর্বপ্রথম নেতাদের নিকটই পেশ করেছেন। পবিত্র কুরআনের সূরায়ে আ'রাফের অষ্টম রুকূ থেকে একাধারে কয়েকটি রুকূতে আল্লাহ পাক নূহ (আ), হূদ (আ), ছালেহ (আ), লূত (আ), শোয়াইব (আ) ও মূসা (আ)-এর ইসলামী আন্দোলনগুলোর যে বর্ণনা দিয়েছেন তাতেও দেখা যায় যে, প্রত্যেক রাসূলই সমাজের নেতৃস্থানীয়দের নিকট দাওয়াত পেশ করতে আদিষ্ট হয়েছেন। সেখানে একথাও প্রমাণিত হয়েছে যে, সমাজপতিগণ প্রত্যেক রাসূলেরই বিরোধিতা করেছে।

www.bjilibrary.com

নেতৃবৃন্দের নিকট প্রথম দাওয়াত পেশ করার কারণ

নেতৃত্বের অধিকারী ব্যক্তিগণ কোন আদর্শকে গ্রহণ না করলে তা বাস্তবায়িত হতে পারে না। এটা কিছুতেই সম্ভব নয় যে, কোন আদর্শের বিপরীত নেতৃত্ব প্রতিষ্ঠিত থাকা অবস্থায় সমাজে সে আদর্শ কায়েম হবে। তাই নবী করীম (স) পয়লা নেতাদেরকে ইসলামের দিকে আকৃষ্ট করার চেষ্টা করলেন। নেতাগণ এ দাওয়াত কবুল না করলেও তাদের নিকট দাওয়াত পৌঁছবার ফলে সমাজের অনেক লোকের নিকটই ইসলামের আওয়ায পৌঁছবার সুযোগ হলো।

ইসলামী আদর্শের উপযোগী নেতৃত্ব ব্যতীত দীন ইসলামকে বিজয়ী করা কিছুতেই সম্ভব নয়। অথচ প্রতিষ্ঠিত নেতৃত্ব ইসলাম কবুল করতে রাজি নয়। এ অবস্থায় যে সব লোক দীনের দাওয়াত কবুল করতে রাজি হলেন তাঁদেরকে নিয়েই আন্দোলন পরিচালনার মাধ্যমে নতুন নেতৃত্ব সৃষ্টি করা ব্যতীত রাসূলুল্লাহ (স)-এর নিকট আর কোন পথই রইল না।

প্রকৃতপক্ষে আদর্শবাদী নেতৃত্ব কোনকালেই তৈয়ার (Ready made) পাওয়া যায় না। আদর্শের আন্দোলনই নতুন নেতৃত্ব সৃষ্টি করে এবং সমাজে যখনই আদর্শভিত্তিক নেতৃত্ব কায়েম হয় তখনই আদর্শকে বাস্তবে রূপদান করা সম্ভব হয়। নেতৃত্বের এ পরিবর্তন হযরতের আন্দোলনের মাদানী স্তরে গিয়ে সম্ভব হলো। অতঃপর আট বছরের দীর্ঘ সংগ্রামের পর আরবের বুকে ইসলামী নেতৃত্ব প্রতিষ্ঠিত হলো। বিশ্বনবীর এ কার্যক্রম যে সুষ্ঠু রাজনীতির সন্ধান দেয় তা প্রত্যেক আদর্শবাদী বিপ্লবী প্রাণকেই সংগ্রামমুখর করে তোলে। মহানবীর বিপ্লবী জীবনকে অধ্যয়ন করার পর কারও মনে এ প্রশ্ন জাগা সম্ভবই নয় যে, তিনি রাজনীতি করে গেছেন কিনা।

শেষ কথা

বিশ্বনবীর দায়িত্ব পালন করার জন্য রাজনৈতিক কার্যকলাপ যে অপরিপার্য ছিল তা ঐতিহাসিক সত্য হিসাবে প্রমাণিত। রাজনীতির চূড়ান্ত পর্যায় পর্যন্ত না পৌঁছতে পারলে তিনি ইসলামকে বিজয়ী দীন হিসাবে প্রতিষ্ঠিত করতে সক্ষমই হতেন না। আজ যদি কেউ দীন ইসলামকে বাস্তবে প্রতিষ্ঠিত করতে চায় তাহলে রাজনীতির পথে অগ্রসর হওয়া ছাড়া তার আর কোন বিজ্ঞানসম্মত পন্থা নেই।

কিন্তু স্বার্থপর, পদলোভী ও দুনিয়া পূজারীদের রাজনীতি ইসলামের জন্য কোন দিক দিয়েই সাহায্যকারী নয়। ইসলামের নামে যারা এক কালে পাকিস্তান আন্দোলনের নেতৃত্ব দিয়েছিলেন তারা রাজনীতির ক্ষেত্রে নবীর নীতি ও কার্যক্রম অনুরসরণ করেননি বলেই পাকিস্তানে ইসলামী নেতৃত্ব প্রতিষ্ঠিত হতে পারেনি।

স্বার্থপর ও গদিভিত্তিক রাজনীতি যেমন ইসলামবিরোধী, নবীর অবলম্বিত রাজনীতি থেকে পরাঙ্মুখ হওয়াও তেমনি অনৈসলামী। বরং রাসূলগণ যে ধরনের রাজনীতি করেছেন তা মুসলমানদের জন্য প্রধানতম ফরয। এ ফরযটির নাম হচ্ছে জিহাদ। জিহাদ মানেই ইসলামী আন্দোলন এবং রাজনীতিই এ আন্দোলনের অন্যতম প্রধান অবলম্বন। সুতরাং কতক লোক পরহেযগারীর দোহাই দিয়ে রাজনীতি করা অপছন্দ করলেও রাসূলের খাঁটি অনুসারীদের পক্ষে তা পছন্দ না করে কোন উপায়ই নেই।

www.bjilibrary.com

রাহমাতুল্‌লিল্‌ আলামীন

বিশ্বনবী হযরত মুহাম্মদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে সম্বোধন করে আল্লাহ পাক বলেছেন ঃ

وَمَا اَرْسَلْنٰكَ اِلَّا رَحْمَةً لِّلْعٰلَمِيْنَ ـ (সূরায়ে আম্বিয়া ঃ ১০৭)

এ আয়াতটির দু'রকম অনুবাদ হতে পারে। দু'রকম তরজমার মর্ম অবশ্য একই।

১। '(হে রাসূল!) আমি যে আপনাকে পাঠিয়েছি তা আসলে সারা জাহানের জন্য আমার রহমত।'

২। 'আমি আপনাকে সারা জাহানের জন্য রহমত হিসেবেই পাঠিয়েছি।

সূরা আম্বিয়া মাক্কী যুগের মধ্যবর্তী সময়ে নাযিল হয়, যখন কোরাইশদের নেতৃত্বে মক্কাবাসীরা রাসূল (স)-এর বিরুদ্ধে সব রকম দুশমনি করছিল। তারা সাহাবায়ে কেরাম (রা)-এর উপর যুলুম অত্যাচার চালিয়ে ইসলাম ত্যাগ করতে বাধ্য করার অপচেষ্টা চালাচ্ছিল। তারা রাসূল (স)-কে তাদের উপর এক মহা মুসিবত মনে করছিল। তারা যখন দেখল যে, তাদের পৌত্তলিক ধর্মের অসারতা উপলব্ধি করে দিন দিন নতুন লোক ইসলাম কবুল করছে, তখন তারা অস্থির হয়ে উঠল।

যখন দেখা গেল যে, কারো ছেলে, কারো পিতা, কারো ভাই, কারো মেয়ে, কারো স্বামী, কারো স্ত্রী বাপ-দাদার ধর্ম ত্যাগ করেছে, তখন মক্কাবাসী কাফেররা বলতে লাগল, "আমাদের সমাজের ঘরে ঘরে আজ অশান্তি ছড়িয়ে যাচ্ছে। আমরা কত শান্তিতে ছিলাম। এখন প্রতি ঘরে বিভেদ দেখা দিয়েছে।" এ সব কথার জওয়াবে আল্লাহ তাআলা এ আয়াতে বলছেন, "হে জাহেলের দল! তোরা যাঁকে আপদ মনে করে দুশমনি করছিস, তিনি তো সারা জাহানের জন্যে শান্তির বাহন। তিনি আমার রহমত হিসেবেই প্রেরিত হয়েছেন। তোরা তাঁকে অবাঞ্ছিত মনে করিস?"

এ আয়াতে লক্ষ্য করার বিষয় যে, রাসূল (স)-কে সম্বোধন করে কথাটি বলা হয়েছে। এতে আল্লাহ পাক তাঁর প্রিয় রাসূলকে মহব্বতের সুরে পরম সান্ত্বনা দেবার জন্য বলেছেন, 'অবিশ্বাসীরা আপনাকে তাদের জন্য যত অপছন্দনীয়ই মনে করুক, আপনি আসলে আমার রহমতেরই মাধ্যম। ওরা যাই বলুক তাতে আপনার কিছুই আসে যায় না। আমি ঘোষণা করে দিলাম যে, আপনি সবার জন্যেই রহমত। তারা মূর্খতার অন্ধকারে পড়ে থাকায় আপনাকে তাদের জন্য অশান্তির কারণ মনে করছে, তারা নিজেরাই আমার রহমত থেকে বঞ্চিত আছে।

এই আয়াতটির সামাজিক ব্যাখ্যা

যেসব বেইনসাফী ও অসম রীতিনীতির ফলে এবং শাসকশ্রেণীর যুলুম নির্যাতনে জনগণ দুঃখ, কষ্ট ও অশান্তি ভোগ করে, সেসব ব্যবস্থা বদলিয়ে আল্লাহর দেওয়া ইনসাফপূর্ণ আইন দিয়েই রাসূলকে পাঠানো হয়েছে। মানব রচিত ভ্রান্ত ও ভারসাম্যহীন সমাজব্যবস্থার কারণেই যুগে যুগে মানুষ অশান্তির আগুনে জ্বলছে। ফিরআউনের মতো শাসক, কারূনের

www.bjilibrary.com

ন্যায় শোষক ও স্বার্থপর সমাজপতিরা আল্লাহর বিধানকে সহ্য করতে পারেনি। কারণ আল্লাহর চোখে সব মানুষ সমান বলে তিনি যে আইন দিয়েছেন তাতে জনগণকে শোষণ করার কোন সুযোগ নেই।

যুগে যুগে মানব সমাজে যত অশান্তি দেখা গেছে, আজও সারা দুনিয়ায় মানবতা যে দুর্গতি পোহাচ্ছে এর জন্য মানুষই দায়ী। আল্লাহ মানুষের এ দুরবস্থার জন্য মোটেই দায়ী নন বলে কুরআনে স্পষ্ট ভাষায় ঘোষণা করেছেন। আল্লাহ বলেন ঃ

ظَهَرَ الْفَسَادُ فِى الْبَرِّ وَالْبَحْرِ بِمَا كَسَبَتْ اَيْدِى النَّاسِ ـ

অর্থাৎ "জলে স্থলে যে বিশৃঙ্খলা ছেয়ে আছে তা মানুষের হাতেরই কামাই।"(সূরা রূম ঃ আয়াত ৪১)

এ আয়াতে মানব জাতিকে লক্ষ্য করে আল্লাহ পাক ঘোষণা করেছেন যে, "তোমরা সর্বত্র যে অশান্তি ও ফাসাদে ডুবে আছ এর জন্য আমাকে দায়ী করো না। এর জন্য তোমরা নিজেরাই দায়ী। তোমরা আমার বিধানকে অমান্য করে নিজেদের মনগড়া নিয়ম চালু করেই এ অশান্তি কামাই করেছ।"

সূরা রূমও মাক্কী যুগের সূরা। উপরিউক্ত আয়াতে মক্কাবাসীকে বলা হয়েছে যে, "তোমরা প্রকৃতপক্ষে অশান্তির জীবনই যাপন করছ। তোমাদের মধ্যে এই যে মারামারি, ফেতনা-ফাসাদ ও যুলুম-অত্যাচার তোমাদের জীবনকে অশান্তিতে জর্জরিত করে রেখেছে, এ থেকে মুক্তি দেবার জন্যই আমি রাসূল পাঠিয়েছি। অথচ তোমরা তাকেই অশান্তির কারণ মনে করছ। আমি তাঁকে রহমতস্বরূপ পাঠালাম, আর তোমরা তাকে আপদ মনে করছ। যে অশান্তিতে তোমরা নিমজ্জিত তা তোমাদেরই সৃষ্টি। এ থেকে বাঁচতে হলে রাসূল (স)-কে অনুসরণ করো।"

এ তো গেল সূরা আম্বিয়ার ঐ আয়াতটির সামাজিক ব্যাখ্যা। আয়াতটির বৈজ্ঞানিক ব্যাখ্যা আধুনিক শিক্ষিতদের উপলব্ধি করা প্রয়োজন।

আয়াতটির বৈজ্ঞানিক ব্যাখ্যা

সূরা আম্বিয়ার উপরিউক্ত আয়াতের এমন আধুনিক ব্যাখ্যা হতে পারে, যা এ বিজ্ঞানের উন্নতির যুগে সহজেই বোধগম্য হয়। এটাকে বৈজ্ঞানিক ব্যাখ্যাও বলা যেতে পারে। বিজ্ঞানের এমন অদ্ভুত উন্নতি হয়েছে যে, আল্লাহর তৈরি বড় বড় শক্তি এখন মানুষের হাতের মুঠোয় এসে গেছে। কিন্তু এ দ্বারা কি মানুষ সুখী হয়েছে? বিজ্ঞান মানুষের জন্য যতটা বস্তুগত আরাম যুগিয়েছে তার চেয়ে বেশি মানসিক অশান্তির জন্ম দিয়েছে। এর জন্য অবশ্য বিজ্ঞান দায়ী নয়, মানুষই দায়ী। বিজ্ঞান চর্চার ফলে প্রকৃতির যেসব শক্তি মানুষের আয়ত্তে আসে, তা মানব কল্যাণেও ব্যবহৃত হতে পারে। আবার মানব জাতিকে ধ্বংসের উদ্দেশ্যেও তা কাজে লাগানো হচ্ছে। পারমাণবিক শক্তি মানব জাতির খেদমতের ব্যবহার করলে তা আল্লাহর রহমত বলেই প্রমাণিত হতে পারে। কিন্তু গত মহাযুদ্ধে জাপানের হিরোশিমা ও নাগাসাকীতে পারমাণবিক বোমা ফেলে যে অভূতপূর্ব ধ্বংসলীলা চালানো হলো তা ইতিহাসে মানবজাতির মহা কলঙ্ক হিসেবেই গণ্য হয়ে আছে। ঐ বোমার ফলে ঐ দুটো শহরের মানুষই শুধু ধ্বংস হয়নি, পশু-পাখি, গাছ-পালা, এমনকি ঐ

www.bjilibrary.com

এলাকায় মাছসহ সমস্ত জলজ প্রাণী এমনভাবে ধ্বংস হয়েছে, যা ইতঃপূর্বে কেউ কল্পনাও করতে পারেনি।

এ দ্বারা প্রামাণিত হলো যে, মানুষ যখন আল্লাহর দেওয়া শক্তিকে নিজেদের খেয়াল-খুশি মতো ব্যবহার করে তখন শুধু মানব জাতির অশান্তি হয় না, গোটা সৃষ্টি জগতই ধ্বংসের শিকার হয়। এ পৃথিবী তখনই ধ্বংস হবে যখন গোটা মানব জাতি আল্লাহর অবাধ্য হয়ে যাবে। যতদিন মানুষ আল্লাহর দেওয়া জীবনবিধান মেনে চলবে ততদিনই দুনিয়া বেঁচে থাকবে। বিজ্ঞানের যত অগ্রগতি হচ্ছে তা মানুষের ধ্বংসকেই ত্বরান্বিত করছে। হাইড্রোজেন ও নাপাম বোমার শক্তি এমন ভয়ঙ্কর যে, কয়েকটি বোমাই পৃথিবীকে ধ্বংস করার জন্য যথেষ্ট।

তাহলে দেখা যাচ্ছে যে, আল্লাহর পক্ষ থেকে রাসূল (স) এমন জীবনবিধান নিয়ে এসেছেন যা মানব সমাজে চালু হলে শুধু মানুষই শান্তি পায় না, সমস্ত সৃষ্টিই ধ্বংস বিপর্যয় থেকে রক্ষা পায়। এ জন্যই কুরআন পাকে রাসূল (স)-কে "রাহমাতুল-লিন নাস" বা "মানুষের জন্য রহমত" না বলে "রাহমাতুললিল আলামীন" বলা হয়েছে। অর্থাৎ তিনি শুধু মানব জাতির জন্যই রহমত নন, সারা জাহানের জন্যই রহমত; গোটা সৃষ্টি জগতের জন্যই রহমত।

বিজ্ঞান মানুষের হাতে বস্তুগত শক্তি তুলে দেয়। কিন্তু এ শক্তিকে কিভাবে কাজে লাগানো উচিত এবং কিভাবে ব্যবহার করা অনুচিত সে বিষয়ে মানুষকে পথ দেখাবার দায়িত্ব বিজ্ঞানের নেই। প্রকৃতির বিধান ও বস্তুজগতের সব কিছুর উপর গবেষণা করাই বিজ্ঞানের কাজ। ঐ বৈজ্ঞানিক গবেষণার ফল হাতে পাওয়ার পর মানুষ কিভাবে ব্যবহার করবে সে বিষয়ে সিদ্ধান্ত নেবার দায়িত্ব তারই যে সেটা ব্যবহার করবে। মানুষই বিজ্ঞানের ফসলকে কাজে লাগায়। মানুষ যদি খারাপ হয় তাহলে সে বিজ্ঞানের দানকে খারাপ কাজ ও উদ্দেশ্যেই ব্যবহার করে। ভালো মানুষ কখনও খারাপ কাজে তা ব্যবহার করে না।

মানুষের হাতে গবেষণার ফল তুলে দিলেই বিজ্ঞানের কাজ শেষ হলো। এর পরই শুরু হলো নবীর কাজ। বিজ্ঞানের কাজ যেখানে শেষ, নবীর কাজ সেখান থেকেই শুরু। দুনিয়ায় কিভাবে চললে ভালো মানুষ হওয়া সম্ভব, আল্লাহর দেওয়া এ বস্তুজগৎকে কিভাবে ব্যবহার করলে মানুষ দুনিয়ায় শান্তি পাবে এবং আখিরাতে মুক্তি পাবে তা শেখাবার দায়িত্ব রাসূলের, এ কাজ বিজ্ঞানের নয়। রাসূলের প্রদর্শিত পথে যে মানুষ চলে সে বিজ্ঞানের দানকেও আল্লাহর রহমতই মনে করে এবং এমনভাবেই সে তা ব্যবহার করে, যার ফলে মানব সমাজে শান্তি বৃদ্ধি পায়। নবীর শিক্ষাকে অগ্রাহ্য করায় বিজ্ঞানের উন্নতি আজ মানব জাতিকে চরম বিপর্যয়ের সম্মুখীন করেছে। পারিবারিক জীবন থেকে শুরু করে আন্তর্জাতিক পর্যায় পর্যন্ত আজ অশান্তির প্রাধান্যকে অস্বীকার করতে পারে? এ থেকে মুক্তির একই পথ আর তা হলো রাসূল (স)-কে রাহমাতুল-লিল আলামীন মেনে নিয়ে তাঁর পথে চলা। হয় মানব জাতিকে হানাহানি করে ধ্বংস হতে হবে, আর নয় তো বাঁচতে হলে রাহমাতুল-লিল আলামীনের আদর্শ মানুষ মেনে নিয়ে তাঁর আনীত জীবন বিধানকে বাস্তবে পালন করতে হবে।

www.bjilibrary.com

রবিউল আউয়ালের পয়গাম

রাহমাতুললিল আলামীন বিশ্বনবী হযরত মুহাম্মদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এমন একটি পেয়ারা নাম যা প্রত্যেক মুসলিম তার অন্তরে মহব্বতের সাথে স্মরণ করে থাকে। আমলের দিক দিয়ে কারো মধ্যে যত কমতিই থাকুক, রাসূল (স)-এর প্রতি মহব্বত সবার মধ্যে কম-বেশি অবশ্যই আছে। আমলের দিকে দিয়ে যে যত বেশি অগ্রসর এ মহব্বত তার অন্তরে ততই গভীর।

এ মহব্বতের কোন তুলনা নেই। মুমিনের দিলে যে কারণে আল্লাহ তাআলার মহব্বত গভীর, সে কারণেই রাসূল (স)-এর প্রতি মহব্বত গভীর হওয়া স্বাভাবিক। আল্লাহ পাক বলেন, "যারা ঈমানদার তাদের মহব্বত আল্লাহর জন্যই বেশি" (বাকারা ঃ ১৬৫)। আল্লাহ পাক আবার বলেন, "হে রাসূল! আপনি বলে দিন যে, যদি তোমরা আল্লাহকে ভালোবেসে থাক, তাহলে আমার অনুকরণ করো, তাহলে আল্লাহই তোমাদের ভালোবাসবেন।" এ দু'টো আয়াত থেকে বুঝা গেল যে, মুমীন আল্লাহকেই বেশি ভালোবাসে এবং এ ভালোবাসা প্রকাশের একমাত্র পথ হলো রাসূলের অনুসরণ, অনুকরণ ও আনুগত্য। কিন্তু রাসূল (স)-কে ভালোবাসা ছাড়া কি তাঁর আনুগত্য সম্ভব? তাই আল্লাহকে ভালোবাসার স্বাভাবিক পরিণতিই হলো রাসূল (স)-কে ভালোবাসা।

রাসূল (স)-এর প্রতি ভালোবাসা কি পরিমাণ থাকা উচিত সে কথা রাসূল (স) স্বয়ং স্পষ্ট করেই জানিয়ে দিয়েছেন। তিনি বলেছেন ঃ

"তোমাদের কেউ সত্যিকারের মু'মিন হবে না, যে পর্যন্ত আমি তার নিকট তার পিতা, পুত্র ও সকল মানুষের চেয়ে বেশি প্রিয় বলে গণ্য না হব।"

আল্লাহ পাক পিতা-মাতা, স্ত্রী-পুত্র, ভাই-বেরাদর ও আত্মীয়-স্বজনকে ভালোবাসা কর্তব্য বলে জানিয়েছেন। কিন্তু কারো প্রতি ভালোবাসা যেন রাসূলের চেয়ে বেশি না হয়, বরং সবার চাইতে যেন রাসূলের প্রতি ভালোবাসা অধিকতর গভীর ও তীব্র হয়, সে কথাই এ হাদীসে বলা হয়েছে।

এখন প্রশ্ন হলো যে, আমাদের ভালোবাসা রাসূলের জন্য সবচেয়ে বেশি কিনা তা যাচাই করার উপায় কি? এর হিসাব নেওয়া কঠিন নয়। অন্য কোন মানুষের প্রতি ভালোবাসার দাবি পূরণ করতে গিয়ে যদি রাসূল (স)-এর নাফরমানী করা হয় তাহলে বুঝা গেল যে, রাসূলের প্রতি ভালোবাসা অন্যের তুলনায় কম।

বাস্তবে এটাই দেখা যায় যে, মানুষ প্রিয়জনের প্রতি স্নেহ-ভালোবাসায় অন্ধ হয়ে তাদের মঙ্গলের নিয়তেই এমন কিছু করে, যা করতে গিয়ে আল্লাহ ও রাসূলের হুকুম অমান্য করে। রাসূলের প্রতি গভীর ভালোবাসা থাকলে সে এমনটা করবে না। যারা এমন বোকামি করে তাদের সম্পর্কে রাসূল (স) বলেছেন ঃ

"যে অন্য লোকের দুনিয়া বানাবার জন্য নিজের আখিরাত নষ্ট করে, কিয়ামতের দিন সেসব চেয়ে বেশি নিকৃষ্ট বলে গণ্য হবে।"

www.bjilibrary.com

রবিউল আউয়াল

মু'মিনের দিলে রাসূলের প্রতি যে মহব্বতের দরিয়া প্রবাহিত হয় তাতে রবিউল আউয়াল মাসে যেন বান ডাকে। মহব্বতের এ জোয়ার এ মাসে সর্বত্রই টের পাওয়া যায়। সীরাতুন নবীর এত চর্চা আর কোন মাসে হয় না। বড় বড় মাহফিলে, মসজিদে, অফিসে, বাড়িতে, সর্বত্র এ মাসে অনুষ্ঠানের ব্যাপক আয়োজন হয় এবং তাতে রাসূল (স)-এর জীবন থেকে শিক্ষণীয় বিষয় সম্পর্কে ইসলামী চিন্তাবিদ ও ওলামায়ে কেরাম মূল্যবান আলোচনা পেশ করেন।

এ সব অনুষ্ঠানে সমবেতভাবে রাসূল (স)-এর প্রতি যে পরিমাণ দরূদ ও সালাম পেশ করা হয় বছরের আর কোন মাসে এতটা হয় না। এ মাসটি এ ব্যাপারে এমন এক বৈশিষ্ট্যের অধিকারী যার কোন তুলনা নেই। বিশেষকরে ১২ই রবিউল আউয়াল ঘরে ঘরে যেভাবে মিলাদের অনুষ্ঠান করা হয়, এমনভাবে এক দিনে আর কোন সময় করতে দেখা যায় না।

মিলাদ মাহফিল ও দোয়ার মাহফিল

মিলাদ অনুষ্ঠানের প্রসঙ্গ উল্লেখ করতে গিয়ে একটি বিষয় মুসলিম সমাজ, বিশেষ করে ওলামায়ে কেরামের দৃষ্টি আকর্ষণ করা প্রয়োজন মনে করছি।

আমাদের দেশে সারা বছরই বিভিন্ন উপলক্ষে যেসব দোয়ার মাহফিল হয়, তা সাধারণত "মিলাদ মাহফিলের" নামেই হয়ে থাকে। মৃতের জন্য দোয়া, নতুন বাড়ি বা দোকান উদ্বোধন উপলক্ষে দোয়া, বিয়ে-শাদী উপলক্ষে দোয়ার যে অনুষ্ঠান করা হয়, তা খুবই ভালো রেওয়াজ। মুসলমানদের সব কাজই আল্লাহর নামে ও রাসূল (স)-এর শিক্ষা অনুযায়ী হওয়া উচিত। এসব দোয়ার মাহফিল উপলক্ষে আল্লাহ ও রাসূল (স) সম্পর্কে যে চর্চা হয় তা সত্যিই প্রশংসনীয়।

কিন্তু এ অনুষ্ঠানগুলোর নাম "মিলাদ মাহফিল" রাখা কি যুক্তিপূর্ণ? মিলাদ শব্দের অর্থ জন্মদিন। রাসূল (স)-এর জন্মদিন হলো ১২ই রবিউল আউয়াল। সে দিনের অনুষ্ঠানকে "মিলাদ মাহফিল" নাম দেওয়া অবশ্যই যুক্তিযুক্ত। আরব দেশগুলোতেও এ দিনটিকে "ঈদে মিলাদুন্নবী" হিসাবে পালন করা হয়। কিন্তু এ দিনটি ছাড়া সারা বছরই রাসূল (স)-এর জন্মদিবস পালন করা কি অর্থহীন নয়? দোয়ার মাহফিল যখন করা হয় তখন এর নাম মিলাদ মাহফিল রাখার চেয়ে "দোয়ার মাহফিল" বলাটাই সঠিক ও যথাযথ।

১২ই রবিউল আউয়ালের গভীর তাৎপর্য

১২ই রবিউল আউয়াল বিশ্বনবী (স)-এর জন্ম দিবস হিসেবেই পালন করা হয়। অথচ তিনি এ তারিখে ইন্তিকালও করেছেন। কিন্তু এ দিনটি তাঁর মৃত্যুর দিবস হিসেবে কখনও পালন করা হয় না।

সব দেশে ও সব জাতির মধ্যেই মহান ব্যক্তিদের জন্ম ও মৃত্যুদিবস পালন করার রীতি চালু আছে। জাতীয় নেতা, স্বাধীনতা আন্দোলনের হিরো ও বিভিন্ন দিক দিয়ে যারা দেশ বা জাতির জন্য গৌরবময় ব্যক্তিত্ব হিসেবে গণ্য তাদের জন্মদিবস যেমন পালন করা হয়,

www.bjilibrary.com

তেমনি তাদের মৃত্যুদিবসও পালন করা হয়ে থাকে। কিন্তু বিশ্বনবী (স)-এর মৃত্যুদিবস কেন পালন করা হয় না? যদি তাঁর জন্ম ও মৃত্যু দিবস একই দিনে না হতো তাহলে হয়ত তাঁর মৃত্যু দিবসও পালন করা হতো। তাঁর জন্ম ও মৃত্যু একই দিনে হওয়ায় শুধু জন্ম দিবস পালন করার সুযোগ রয়েছে। এ বিষয়টির মধ্যে কি কোন তাৎপর্য নিহিত নেই?

যিনি হায়াত ও মওতের একমাত্র মালিক তিনি কি কোন হিকমত ছাড়াই তাঁর সর্বশেষ রাসূলের জন্ম ও মৃত্যু একই দিনে নির্দিষ্ট করেছেন? দুনিয়ার আর কোন মানুষ সম্পর্কে তিনি এ ব্যবস্থা করেছেন বলে আজ পর্যন্ত জানা যায়নি। বিশ্বনবী (স)-এর বেলায় এমন নযীরবিহীন ব্যবস্থা কেন করা হয়েছে তার আসল কারণ আল্লাহ রাব্বুল আলামীনই জানেন।

এ বিষয়টা নিয়ে এক সময় যখন আমার মনে প্রশ্ন সৃষ্টি হয়েছিল তখন যে জওয়াব আমার নিকট যুৎসই মনে হয়েছে তা বহু সীরাত মাহফিলে পেশ করেছি এবং শ্রোতাগণ সে জওয়াবে আমারই মতো তৃপ্তিবোধ করেছেন। এ পর্যন্ত অন্য কোন জওয়াব কেউ দিয়েছেন কিনা জানতে পারিনি।

একই তারিখে রাসূল (স)-এর জন্ম ও মৃত্যু হওয়ার দরুন সবাই বাধ্য হয়ে শুধু জন্মদিবসই পালন করছে। কেউ মৃত্যু দিবস হিসেবে ঐ দিবসটি পালনের কল্পনাও করতে পারছে না। এর কোন সুযোগই রাখা হয়নি।

এ ব্যবস্থা দ্বারা এ কথাই যেন ঘোষণা করা হয়েছে যে, শেষ নবীর মৃত্যু নেই। মুহাম্মদ বিন আবদুল্লাহ নামক মানুষটির দৈহিক তিরোধান হলেও মুহাম্মাদুর রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের মৃত্যু নেই। তিনি রাসূল হিসেবে দুনিয়ায় কিয়ামত পর্যন্ত স্থায়ী। আর কোন রাসূল আসবে না,

তাঁর নবুয়্যাত ও রিসালাত চিরস্থায়ী। এ রাসূলের জন্যই আছে, তাঁর মৃত্যু নেই। তাঁর মৃত্যুহীন মর্যাদা চিরস্থায়ী করার মহান উদ্দেশ্যেই আল্লাহ তাআলা তাঁর জন্য এ বিশেষ ব্যবস্থা করেছেন, যাতে মানুষ শুধু তার জন্মের উৎসব পালন করতে বাধ্য হয় এবং মৃত্যু দিবস পালনের কোন সুযোগই না পায়।

রাসূল (স)-এর "খাতামুন নাবিয়্যিন" হিসেবে যে মহান মর্যাদা আল্লাহ পাক কুরাআনে ঘোষণা করেছেন সে মর্যাদার এটাই স্বভাবিক দাবি। তাই এ দাবি পূরণ করার ক্ষমতা যার হাতে রয়েছে তিনি সুপরিকল্পিতভাবেই তার ব্যবস্থা করেছেন।

রাসূল (স)-এর নবুওয়াতের এ স্থায়ীত্ব ও শ্রেষ্ঠত্ব এ দুনিয়ায়ই সীমাবদ্ধ নয়। আখিরাতেও তাঁর নবুওয়াতের পতাকাতলেই সকল নবী সমবেত হবেন বলে হাদীসে বর্ণিত হয়েছে।

হযরত আবূ সাঈদ (রা) থেকে বর্ণিত, রাসূল (স) বলেছেন, "কিয়ামতের দিন আমিই সকল আদম সন্তানের সর্দার হব। আমি এ কথা গর্ব প্রকাশের জন্য বলছি না। সেদিন আদম ও অন্যান্য সব নবী আমার পতাকাতলে থাকবেন। আর আমি প্রথম ব্যক্তি যার কবর সবার আগে ফাটবে। এ কথাও আমি গর্ব হিসেবে বলছি না।" (তিরমিযী)

www.bjilibrary.com

খোলাফায়ে রাশেদীনের মর্যাদা

খোলাফায়ে রাশেদীন কথাটা প্রথম চারজন খলীফার জন্যই প্রযোজ্য। নবী করীম (স)-এর পর হযরত আবূ বকর সিদ্দীক (রা), হযরত ওমর (রা), হযরত ওসমান (রা) ও হযরত আলী (রা)–এই চারজনকে এ উপাধি দেওয়া হয়েছে। এ উপাধি উম্মত দেয়নি, স্বয়ং নবী (স) দিয়েছেন।

নবী করীম (স) পরিষ্কার বলেছেন, "আলাইকুম সুন্নাতী, ওয়া সুন্নাতু খোলাফায়ে রাশেদীনাল মাহদীঈন" অর্থাৎ তোমাদের উপর আমার সুন্নাত যেমন পালনযোগ্য, তেমনি সঠিক পথে প্রতিষ্ঠিত ও পরিচালিত আমার খলীফাগণকেও এভাবে তোমাদের পালন করা কর্তব্য।

আরেকটি পরিভাষা আমরা নবীর কাছ থেকে পাই। সেটা হচ্ছে খেলাফত আলা মিনহাজুন্নবুয়্যত অর্থাৎ নবুয়্যতের মানে (স্ট্যান্ডার্ডে) খেলাফত।

খলীফার অর্থ তো প্রতিনিধি এবং আল্লাহ তাআলা যখন বলেন, "ইনি জায়িলুন ফিল আরদি খলীফা", তখন তিনি মানুষকেই খলীফা বলেছেন। সাধারণভাবে যে আল্লাহর আনুগত্য এবং রাসূলের আনুগত্য করে সেই খলীফা।

কিন্তু খোলাফায়ে রাশেদীনের মধ্যে যে খলীফা শব্দটি ব্যবহার করা হয়েছে, এটা সে অর্থে নয়; এখানে খলীফা অর্থ খলীফাতুর রাসূল। খলীফাতুল্লাহ তো সব মুসলিমই, যারা আল্লাহর আনুগত্য ও রাসূলের আনুগত্য ঠিকমত করে। কিন্তু যারা মুসলিম রাষ্ট্র পরিচালনার দায়িত্ব পান, তারা হলেন খলীফাতুর রাসূল। অর্থাৎ রাসূল (স) দুনিয়ায় থাকাকালে নেতৃত্বের যে দায়িত্ব পালন করে গেছেন, তাঁর অনুপস্থিতিতে তাঁর পক্ষ থেকে সেই কাজটাই তার দায়িত্ব। তাঁদের আরেকটি উপাধি হচ্ছে আমীরুল মু'মিনীন। তারা মু'মিনদের আমীর, মু'মিনদের হুকুমকর্তা। তাঁরা মু'মিনদের শাসক ও নেতা।

খোলাফায়ে রাশেদীন রাসূল (স)-এর প্রতিনিধি হিসেবেই দায়িত্ব পালন করেছেন। নবী করীম (স)-এর আর্দশের উপর নিষ্ঠার সঙ্গে শাসন করেছেন এবং এটাকেই বলে 'খিলাফত আ'লা মিনহাজুন নবুওয়্যত। অর্থাৎ নবুয়াতের যে মান, সেটাকে সামনে রেখেই প্রতিনিধিত্ব করা হয়েছে। এই পরিভাষাটাও আল্লাহর রাসূলের দেওয়া এবং এই চার খলীফা এই মানটা রক্ষা করে যে চলেছেন ইতিহাস তার সাক্ষী এবং সারা উম্মাতে মুসলিমাহ এ বিষয়ে একমত। আমরা লক্ষ্য করি যে, হযরত আলী (রা)-এর পর হযরত মুয়াবিয়া (রা) দীর্ঘকাল ইসলামী রাষ্ট্রের শাসক ছিলেন। তিনি সাহাবী ছিলেন বলেই তাঁর নামের পরে আমরা রাদিয়াল্লাহু তাআলা আনহু বলি। এ সত্ত্বেও তাঁকে খোলাফায়ে রাশেদার অন্তর্ভুক্ত বলে উম্মতের আলিমগণ গণ্য করেননি। অথচ একজন তাবেয়ী হযরত ওমর বিন আব্দুল আজীজ (র) যিনি হযরত মুয়াবিয়া (রা)-এর পর কয়েকজন শাসকের পরে ক্ষমতায় এসেছেন, তিনি খোলাফায়ে রাশেদীনের মধ্যে গণ্য বলে ইতিহাস স্বীকার করে। সারা উম্মত স্বীকার করে নিয়েছে যে, তিনি খোলাফায়ে রাশেদীনের অন্তর্ভুক্ত।

www.bjilibrary.com

আমরা ওমর বিন আবদুল আজীজ রাদিয়াল্লাহু তাআলা আনহু না বলে রহমাতুল্লাহি আলাইহি বলি। তিনি সাহাবী নন বলে রাদিয়াল্লাহু তাআলা আনহু বলি না। কিন্তু ইতিহাসে তাকে দ্বিতীয় ওমর বলা হয়। এর দ্বারা এ কথা প্রমাণ হয় যে, খেলাফত আলা মিনহাজুন নবুয়্যাত একটা মানের নাম, একটা স্ট্যান্ডার্ডের নাম এবং যে বৈশিষ্ট্যগুলো ঐ চারজনের মধ্যে ছিল, ওমর বিন আবদুল আজিজ (র) আবার তা বহাল করবার চেষ্টা করেছেন। যদিও স্বল্পকাল তিনি শাসন করেছেন, তবুও এ সময়ে তিনি ঐ বৈশিষ্ট্যগুলোকেই প্রতিষ্ঠিত করেছেন। হযরত মুয়াবিয়া (রা)-এর সময়ে সে উচ্চমান পুরোপুরি রক্ষিত হয়নি যদিও তিনি সাহাবী ছিলেন। এর কারণেই তাকে খোলাফায়ে রাশেদীনের মধ্যে গণ্য করা হয় না।

তাহলে বুঝা গেল, কাকে খোলাফায়ে রাশেদীনের মধ্যে গণ্য করা হবে, আর কাকে করা হবে না এবং খেলাফত আলা মিনহাজুন নবুয়্যাতের কি স্ট্যান্ডার্ড তা নির্ধারিত আছে এবং সেটার মানে যাচাই করেই সিদ্ধান্ত নিতে হয় যে, কাকে আমরা কি স্থান দেব। খোলাফায়ে রাশেদীনকে আল্লাহর রাসূল আরও মর্যাদা দিয়েছেন যে, দুনিয়ায় থাকতেই তাঁদেরকে তিনি জান্নাতী বলে ঘোষণা করেছেন, তাঁরা প্রথম চার খলীফা। যে দশজন সাহাবীকে জান্নাতী বলে রাসূল (স) ঘোষণা করেছেন, তার মধ্যেই এই চারজন রয়েছেন। যদি আমরা তাঁদেরকে তাঁদের ঐ মর্যদায় না রাখি রাসূলের পরেই যদি তাঁদেরকে মর্যাদা না দেই, তাহলে ইসলামের স্ট্যান্ডার্ডও ঠিক থাকতে পারে না।

দুর্ভাগ্যবশত আমাদের সমাজে পরবর্তী কতক দীনী ব্যক্তিত্ব পরবর্তী কোন সূফী বা কোন বড় জ্ঞানীকে এমন পজিশন দিতে দেখা গেছে, যাতে সাধারণ লোকদের মধ্যে মুহাম্মদুর রাসূলুল্লাহ (স)-এর পর এ চারজন খলীফার যে শ্রেষ্ঠ পজিশন, তা স্পষ্টভাবে বুঝা যায় না।

হযরত আবদুল কাদের জিলানী (র), হযরত মঈনুদ্দীন চিশতী (র) দীনের বড় বড় খাদেম, দীনের বড় বড় সাধক ও সূফী। তাঁদের খেদমতকে অস্বীকার করার ক্ষমতা কারো নেই। কিন্তু তাঁরা তাবেয়ীও ছিলেন না। তাঁদেরকে এমনভাবে পেশ করা হয়, তাঁদের সম্বন্ধে এমন সব বই-পুস্তক আমাদের সমাজে চালু আছে, যার থেকে মানুষের ভুল ধারণা হতে পারে যে, নবী করীম (স)-এর পরেই বোধ হয় তাদের স্থান। ভক্তির আতিশয্যে বড় পীর সাহেব সম্বন্ধে এমন সব কথা লেখা হয়েছে, যা বিশ্বাস করার কোন ভিত্তি খুঁজে পাওয়া যায় না। এমন কথাও লেখা হয়েছে যে, নবী করীম (স) যখন মেরাজে যাবার জন্য বোরাকে চড়েন তিনি নাকি নাগাল পাচ্ছিলেন না। হযরত আবদুল কাদের জিলানী (র) এসে কাঁধ পেতে দিলেন। তাঁর কাঁধে পা রেখে নাকি রাসূল (স)-কে বোরাকে আরোহণ করতে হয়েছিলো। অথচ এ কথা একবারেই হাস্যকর। হযরত আবদুল কাদের জিলানী (র) অনেক পরের বুজুর্গ ব্যক্তিত্ব। এ জাতীয় গাঁজাখুরী কথা প্রচার করে কোন কোন দীনী ব্যক্তিত্বকে এত উর্ধ্বে তুলে ধরা হয়েছে যে, রাসূলের কাছাকাছি এমনকি কোন কোন ক্ষেত্রে রাসূলের উপরেও নিয়ে যাওয়া হয়েছে। এ সমস্ত কথা ইতিহাসের যুক্তিতে টিকে না।

www.bjilibrary.com

নবী করীম (স)-এর প্রত্যেকটি কথা ও কাজের রেওয়ায়েতকেও কঠোরভাবে যাচাই-বাছাই করে তাঁরা গ্রহণ করেছেন। কিন্তু পরবর্তীকালে ইসলামী ব্যক্তিত্ব ও বুজুর্গদের ইতিহাস সেভাবে যাচাই-বাছাই করা হয়নি। ভক্তির আতিশয্যে যারা যেভাবে লিখেছেন সেভাবেই তাঁদের জীবনী প্রচারিত হয়েছে। যার ফলে খোলাফালে রাশেদীন ও সাহাবায়ে কেরামের শ্রেষ্ঠত্ব, বুজুর্গী ও মর্তবার চর্চা সমাজে তেমন চালু নেই। খাজা বাবা ও বড় পীরের চর্চা এত বেশি যে, ঐ বুজুর্গদের পজিশন জনগণের সামনে কমই চর্চা হয়। আমাদেরকে জানতে হবে যে, মুহাম্মদ (স)-এর পরে উম্মতের মধ্যে কার কি পজিশন। কারণ এর উপর ইসলামের সঠিক মর্যাদা নির্ভর করে।

এ কথা কে অস্বীকার করতে পারে যে, নবী করীম (স)-এর পর সর্বশ্রেষ্ঠ মানবগোষ্ঠী হচ্ছেন সাহাবায়ে কেরাম (রা)। সাহাবীদের জামায়াতের চেয়ে শ্রেষ্ঠ কোন জামায়াত কোন দুনিয়ায় হয়নি, হবেও না। এই সাহাবায়ে কেরামের মধ্যে শ্রেষ্ঠ ছিলেন হযরত আবূ বকর ছিদ্দীক (রা)। এর পর হযরত ওমর (রা), এর পর হযরত ওসমান (রা), এরপর হযরত আলী (রা)। এই যে ক্রম, এই যে তরতীব তা আহলে সুন্নাত ওয়াল জামায়াতের আকীদার মধ্যে রয়েছে। আকীদার বইয়ের মধ্যে এটা লেখা রয়েছে যে, মুহাম্মদ (স)-এর পর এই তরতীব অনুযায়ী তাঁরাই হচ্ছেন শ্রেষ্ঠ মানুষ। আফজালুন্নাছি বা'দাল আম্বিয়ায়ে বিত্তাহকীক আবূ বকর সিদ্দীক (রা)-এ কথা খুতবাতেও বলা হয়।

এই যে পজিশন তাঁদের রয়েছে, তা কি আমাদের সমাজে দেওয়া হচ্ছে? যেভাবে চর্চা করা হয় বড়, পীর সাহেবের (র) জীবনী, যেভাবে চর্চা করা হয় খাজা মইনুদ্দীন চিশতী (র)-এর জীবনী, তাতে খোলাফায়ে রাশেদীনের সে পজিশনটা সমাজের মধ্যে অনুভব করা যায় না।

এর চেয়েও বড় আফসোসের বিষয় যে, রাসূল (স)-কে আল্লাহ তাআলা যে পজিশন দিয়েছেন সে পজিশনেও তাঁকে ঠিকমত না রাখার ফলে আজ মুসলিম সমাজে ইসলামের এ দুর্দশা। আল্লাহ তাআলা ঘোষণা করেছেন, "লাকাদ কানা লাকুম ফী রাসূলিল্লাহে উসওয়াতুন হাসানাহ।" তোমাদের জন্য আল্লাহর রাসূলের মধ্যে উৎকৃষ্টতম আদর্শ রয়েছে। রাসূল (স) যে আদর্শ স্থাপন করে গেছেন, সেটা শুধু ধর্মীয় দিকেই সীমাবদ্ধ নয়। কোন ব্যক্তিকে শুধু ধর্মীয় দিক দিয়ে বিশেষ অগ্রসর দেখলেই তাঁকে এমন গুরুত্বপূর্ণ পজিশন দেওয়া হয়, যাতে মনে হয় যে, তিনি আমাদের রাসূলের পুরোপুরি অনুসারী। নবী করীম (স) এক সামগ্রিক আদর্শ স্থাপন করে গেছেন। জীবনের সর্বক্ষেত্রে তিনি আদর্শ। তিনি যুদ্ধের মাঠেও আদর্শ, ইমামতির বেলায়ও আদর্শ, প্রতিবেশীর সঙ্গে ব্যবহারেও আদর্শ, পরিবারের কর্তা হিসেবেও আদর্শ, রাষ্ট্রপতি হিসেবেও আদর্শ, বিচারপতি হিসেবেও আদর্শ এবং তাঁর আদর্শকে ছাড়িয়ে যাবার মতো কোন নেতা আর হতে পারে না।

সুতরাং তিনি এই যে আদর্শ স্থাপন করে গেছেন, তাঁর এ উচ্চমানের আদর্শ যিনি যতটুকু অর্জন করতে পারেন তিনি আমাদের নিকট ততটুকু শ্রদ্ধার যোগ্য। নবী করীম (স) একটি সামগ্রিক জীবনব্যবস্থা দিয়ে গেছেন। যদি কেউ নবীদের একদিকে অগ্রসর হয়ে আধ্যাত্মিকতা এবং ব্যক্তিগত ধার্মিকতার দিক দিয়ে অনেক নিষ্ঠাবান হন, কিন্তু ইসলামকে

www.bjilibrary.com

দুনিয়ায় কায়েমের ব্যাপারে তিনি কোন কাজই না করেন, বা আল্লাহর দীনকে বিজয়ী করার জন্য বাতিলের সাথে টক্করের ধারে-কাছেও না আসেন, তাহলে তাকে কি ঐ পজিশন দেওয়া যায়; যা রাসূলের নায়েব হিসেবে দেওয়া হচ্ছে?

নবী করীম (স) বলেছেন, আল্লাহ তাআলা জিবরাঈল (আ)-কে হুকুম করলেন– জিবরাঈল, তুমি যাও, ঐ বস্তিটাকে উল্টিয়ে দাও। জিবরাঈল (আ) গিয়ে দেখেন যে, সেখানে এমন এক আল্লাহর ওলী আছেন, যিনি কোন সময় আল্লাহকে ভুলেন না। সব সময় আল্লাহর ধ্যানে মগ্ন থাকেন। জিবরাঈল (আ) পেরেশান হয়ে গেলেন যে, এমন ব্যক্তি থাকতে এই বস্তিটাকে উল্টিয়ে দেব? আল্লাহকে জিজ্ঞেস করলেন, ইয়া আল্লাহ, তোমার এ রকম এক ওলী থাকতে আমি বস্তিটাকে উল্টিয়ে দেব? আল্লাহ বললেন যে, আমি তোমাকে হুকুম করবার সময় আমার কি জানা ছিল না, যে আমার কোন ওলী সেখানে বসে আছে? আমার এ রকম ওলীর কোন দরকার নেই, যার চোখের সামনে আমার দীনকে নষ্ট করা হচ্ছে ও আমার নাফরমানী করা হচ্ছে। অথচ তার চেহারা একটুও পরিবর্তিত হচ্ছে না। অর্থাৎ এতে যে সে নারাজ, নারাজীর সে চিহ্নও তার চেহারায় দেখা যাচ্ছে না। সুতরাং তাকেসহ বস্তিটাকে উল্টিয়ে দাও। আমাদের কাছে শ্রদ্ধার পাত্র কে; আর কে নয়, তা যাচাই করার মানদণ্ড হচ্ছে একমাত্র মুহাম্মদুর রাসূলুল্লাহ (স)। যে ব্যক্তি শুধু নামায, রোযা, যিকর ইত্যাদির মাধ্যমে সমাজে পরহেজগার হিসেবে পরিচিত তাঁকেও আমরা শ্রদ্ধা করব। রাসূলের জীবনের যে কোন একটি গুণ যার মধ্যে পাওয়া যাবে তাকেও আমরা শ্রদ্ধা করি। কিন্তু শ্রদ্ধার ব্যাপারে আমাদের হিসাব ঠিক রাখতে হবে। ইকামাতে দীনের কাজ, জিহাদের কাজ, আল্লাহর দীনকে দুনিয়ায় বিজয়ী করার সংগ্রাম, যেটার জন্য দুনিয়াতে রাসূলকে পাঠানো হয়েছে, সে কাজসহ যদি কারো মধ্যে তাকওয়া পরহেজগারী থাকে, তাহলে তাঁর মূল্য অনেক বেশি। এটা ছাড়া শুধু মুত্তাকী, পরহেজগার এবং শুধু আধ্যাত্মিকতা ঐ মর্যাদার অধিকারী হতে পারে না।

এ আলোচনার সার্থকতা তখনই হবে যদি আমরা এ কথা বুঝে নেই যে, আহলে সুন্নাত ওয়াল জামায়াতের আকীদা হলো যে, সম্মান ও শ্রদ্ধার ক্ষেত্রে নবীর পরে সাহাবীগণ এবং সাহাবায়ে কেরামের মধ্যেও প্রথম চারজন খলীফা। ঐ চারজনের মধ্যে ঐ ক্রম অনুযায়ী একজন বেশি, আর একজন তার চেয়ে কম হবেন। আর একজন তাঁর চেয়েও কম। তাহলে পরবর্তীকালের যারা, তারা আরো কম হবেন।

শ্রেষ্ঠত্বের মাপকাঠি আমাদের কাছে আল্লাহ তাআলা পরিষ্কার দিয়ে দিয়েছেন। রাসূল (স)-ই হচ্ছেন সে মাপকাঠি। ঐ মাপকাঠিতে বিচার করেই উম্মাত সিদ্ধান্ত নিয়েছে যে, প্রথম খলীফা ঐ মাপকাঠিতে উত্তীর্ণ, পঞ্চম খলীফা যিনি তিনি সেই মাপকাঠিতে উত্তীর্ণ নন। কিন্তু এর কয়েকজন খলীফার পর উমর ইবনে আবদুল আজীজ (র) আবার ঐ মাপকাঠিতে উত্তীর্ণ। কোন্ মাপকাঠিতে বিচার করে এ সিদ্ধান্ত নেওয়া হলো? সে মাপকাঠি একমাত্র মুহাম্মাদুর রাসূলুল্লাহ (স)। লাকাদ কানা লাকুম ফি রাসূলিল্লাহি উসওয়াতুন হাসানাহ্।

এক হাদীসে আছে, মহানবী (স) বলেন, ঐ দিন, যে দিন আল্লাহর ছায়া ছাড়া আর কোন ছায়া থাকবে না, অর্থাৎ আল্লাহর আরশের ছায়া ছাড়া আর কোন ছায়া থাকবে না, সেদিন

www.bjilibrary.com

সাত রকমের লোক আল্লাহর ছায়া পাবে। তার পয়লা নম্বরে রাসূলুল্লাহ (স) কার নাম নিয়েছেন? 'ইমামুল আদল'– ন্যায় বিচারক শাসক। সেখানে এ কথা বলেননি, যে খুব বেশি নামাযী ও খুব বেশি জাকের। তাদেরকেও অবশ্য স্থান দিবেন। কিন্তু শ্রেষ্ঠ স্থান কার?

আল্লাহর যমীনে আল্লাহর বিধানকে প্রতিষ্ঠিত করার কাজের চেয়ে বড় কোন কাজ নেই। নবী করীম (স)-কে যত কাজের দায়িত্ব দেওয়া হয়েছে, সবই তাঁর প্রধান কাজের সাহায্যকারী হিসেবেই দেওয়া হয়েছে। সে প্রধান কাজটা কি? কুরআন মজীদের তিনটি সূরাতে আল্লাহ পাক উল্লেখ করেছেন– "হুয়াল্লাজি আরছালা রাসূলাহু বিল হুদা ওয়া দীনিল হাক্ক লিইয়ুজহিরাহু আলাদ্‌দীনি কুল্লিহি"– তিনিই সেই সত্তা, যিনি তাঁর রাসূলকে পাঠিয়েছেন হেদায়াত দিয়ে এবং একমাত্র হক্ক দীন দিয়ে যাতে তিনি এ দীনকে আর সব দীনের উপর বিজয়ী করে দেন। অর্থাৎ মানব রচিত যত বিধান আছে সব এ হক্ক দীনের অধীন থাকবে, আর আল্লাহর দীনই প্রাধান্য লাভ করবে। তাফসীরকারকগণ 'লিইয়ুযহিরাহু' শব্দের অর্থ করেছেন লিইয়ুগলিবাহু, তাকে গালিব করার জন্য বা বিজয়ী করার জন্য।

আল্লাহর রাসূলকে দুনিয়ায় এ জন্য আল্লাহ পাঠাননি যে, মানুষ তাদের মনগড়া আইন মেনে চলুক আর তাঁর রাসূল তাদেরকে আল্লাহর আইনের একটু তাবলীগ করে তা পৌঁছিয়ে দিয়েই দায়িত্ব শেষ করবেন। আল্লাহর যমীনে আল্লাহর আইনের বিপরীত আইন চালু থাকবে আর সেই আইনের অধীনে, বাতিল শাসকদের অধীনে, বাতিল গভর্নমেন্টের অধীনে থেকে আল্লাহর দীন পালন করার জন্য যতটুকু পারমিশন পাওয়া যায় ততটুকুতেই সন্তুষ্ট থাকার নির্দেশ রাসূলকে দেওয়া হয়নি। বাতিল শক্তি যতটুকু অনুমতি দেয় ততটুকু দীন পালন করলেই চলবে, এমন অবস্থার জন্য আল্লাহর দীন আসেনি। এ রকম কাপুরুষদের জন্য আল্লাহর দীন পাঠাননি। বাতিল শাসকরা তাদের আইনমত দেশ শাসন করবে আর আমরা খুব নামায-রোযা ও যিকির-আযকার করে আল্লাহ ওয়ালা হবো এবং আল্লাহর দীনের যেসব আমল করতে তাদের আপত্তি নেই, সেটুকুই আমল করবো এ জাতীয় দীন আল্লাহ পাঠাননি।

আমাদের দেশে দেখা যায় যে, যারা ধর্মনিরপেক্ষতা কায়েম রাখতে চায় বা যারা কম্যুনিজম কায়েম করতে চায় তারাও কতক দীনদারকে 'হুজুর' বলে সম্মান করে এবং হাদিয়া দেয়। ইসলামকে যারা বিজয়ী করতে চায় তাদের সাথে কি তারা এ ব্যবহার করে? মুহাম্মদ (স)-এর অনুসারীরা এ ধরনের দুর্বল লোক ছিলেন না। সাহাবায়ে কেরাম তাঁরাই ছিলেন যাঁরা রাসূলের (স) কাজে পূর্ণরূপে শরীক ছিলেন। যারা রাসূলের আসল সংগ্রামে শরীক হয়নি তাদের নামায-রোযা সত্ত্বেও তাদেরকে মুনাফিক বলা হয়েছে। ওহুদের যুদ্ধে রওয়ানার পূর্বে রাসূল (স) মদীনার মসজিদে ইমামতি করলেন। এক হাজার লোক তাঁর সাথে নামায পড়লেন। তিনি তাদেরকে নিয়ে রওয়ানা হলেন। কতদূর গিয়ে আবদুল্লাহ ইবনে উবাইর উসকানি ও প্ররোচনায় তিন'শ লোক পালিয়ে চলে আসলো। আল্লাহ তাআলা রাসূলকে জানিয়ে দিলেন যে, এরা মুনাফিক। এরা রাসূলের পিছনে নামায পড়েছে

www.bjilibrary.com

বলেই তাদেরকে মুসলিম হিসেবে স্বীকার করা হয়নি। রাসূলের মিশন হলো আল্লাহর দীনকে প্রতিষ্ঠিত করা। সে কাজে যারা শরীক নেই তাদের নামায মদীনার মসজিদে রাসূলের ইমামতিতে আদায় করা সত্ত্বেও তা কুবল হলো না।

এ দ্বারা এ কথাই প্রামাণিত হয় যে, আল্লাহর রাসূল (স) আমাদের সবার জন্যই সুস্পষ্ট আদর্শ ও নীতি রেখে গেছেন; কিন্তু আমরা এ স্ট্যান্ডার্ড বিচার করি না বলেই ভক্তি শ্রদ্ধার ব্যাপারে আমরা হিসাব ঠিক রাখতে পারি না। তাই যারা আল্লাহর দীনকে দুনিয়ায় কায়েম করার ব্যাপারে বাতিলের সাথে কোন দিন টক্করে আসে না, তারাও লাখ লাখ লোকদের শ্রদ্ধার পাত্র থাকে। এর কারণ হলো, রাসূলের মিশন সম্পর্কে মানুষের অজ্ঞতা। শ্রদ্ধা পাওয়ার যে মাপকাঠিটি রাসূল (স) দিয়ে গেছেন তা আর চালু নেই।

এই স্ট্যান্ডার্ড যদি সামনে রাখি তাহলে আমরা দেখবো মাদরাসা কায়েম করা থেকে শুরু করে দীনের যে যে খেদমত চালু আছে তা অত্যন্ত মূল্যবান হওয়া সত্ত্বেও আল্লাহর রাসূলের আদর্শ কায়েমের জন্য ঐসব মোটেও যথেষ্ট নয়।

রাসূলুল্লাহর (স) আসল কাজই হলো ইকামাতে দীন। কারণ আল্লাহর দীন বিজয়ী হওয়ার জন্যই এসেছে, বাতিল দীনের অধীনে থাকার জন্য আসেনি। দীন শব্দের অর্থ হলো اِطَاعَتْ বা আনুগত্য। আনুগত্যের বিধান স্বয়ং আল্লাহ দিয়েছেন। মানব সমাজে কে কার আনুগত্য কতটুকু করবে সে কথা শেখাবার জন্যই আল্লাহর দীন এসেছে। আল্লাহ বলেন,

اَطِيْعُوا اللّٰهَ وَاَطِيْعُوا الرَّسُوْلَ وَاُولِى الْاَمْرِ مِنْكُمْ ـ

"তোমারা আল্লাহর আনুগত্য করো, আল্লাহর রাসূলের আনুগত্য করো এবং তোমাদের নেতাদেরও (আনুগত্য করো)।"

এই যে সিস্টেম আল্লাহ দিয়েছেন এই সিস্টেমের বাইরে গিয়ে আমরা আনুগত্য করতে পারি না।

وَمَاكَانَ لِمُؤْمِنٍ وَلَامُؤْمِنَةٍ اِذَا قَضَى اللّٰهُ وَرَسُوْلُهٗ اَمْرًا اَنْ يَكُوْنَ لَهُمُ الْخِيَرَةُ مِنْ اَمْرِهِمْ ـ

আল্লাহ ও রাসূল (স) কোন বিষয়ে নির্দেশ দিলে এর বিরুদ্ধে কোন পুরুষ ও নারীর কোন ইখতিয়ার নেই। সুতরাং আল্লাহর রাসূল (স) যে দীন আমাদের দিয়ে গেছেন, সে দীনের একটা অংশকে আমরা যদি সবটুকু ইসলাম বলে মনে করি তাহলে বুঝা গেল যে, আমরা রাসূলকে আদর্শ বলে গ্রহণ করিনি। ঠিক এ নিয়মেই কোন একজন দীনী ব্যক্তিত্বকে মর্যাদা দিতে হবে। যার মধ্যে যেটুকু গুণ পাওয়া যাবে তাকেই সেই গুণ অনুযায়ী শ্রদ্ধা করা উচিত। যে শুধু কালেমা পড়ে তাকেও আমরা শ্রদ্ধা করি। কারণ যে এটুকু করে না; তার চেয়ে সে অবশ্যই বেশি শ্রদ্ধার পাত্র।

ইকামাতে দীনের দায়িত্ব হলো আল্লাহর দীনকে দুনিয়ায় প্রতিষ্ঠিত বা বিজয়ী করার দায়িত্ব। এ দায়িত্বই রাসূলের আসল কাজ। এ কাজ যারা করেন না তারা অন্যান্য যতগুলো দীনের

www.bjilibrary.com

খেদমত করেন তা দ্বারা কি ইকামাতে দীনের দায়িত্ব পালন করা হলো বলে মনে করেন? মসজিদ কায়েম করা দীনের খেদমত। তাবলীগ জামায়াতের কাজও দীনের খেদমত। ওয়াজ করাও দীনের খেদমত। কিন্তু খেদমতে দীন আর ইকামাতে দীন এক নয়। দীনের খেদমত দ্বারা আপনা আপনি দীন কায়েম হয়ে যাবে না। এ খেদমতগুলো দীন কায়েমের জন্য অবশ্যই সাহায্যকারী। কিন্তু এ খেদমতগুলো দ্বারা আপনি দীন কায়েম হয়ে যাবে না। দুনিয়ার সর্বশ্রেষ্ঠ মাদরাসা দেওবন্দ। কিন্তু এ দেওবন্দ মাদরাসা যে দীন কায়েমের জন্য কোন প্রোগ্রাম নিয়ে কাজ করছে না এটা সবাইর জানা। যদি করতো তাহলে ভারতের ইন্দ্রিরা সরকার এভাবে ১৯৮০ সালে শতবর্ষ উৎসব পালন করতে দিত না। ইন্দিরা গান্ধী দেওবন্দ মাদরাসার ঐ উৎসবে নিজে গিয়ে বক্তৃতা করেছেন। যদি এ মাদরাসায় ইকামাতে দীনের প্রোগ্রাম থাকত তাহলে ইন্দিরা গান্ধী এ মাদরাসা বন্ধ করার চেষ্টা করতো। অবশ্য দেওবন্দ মাদরাসা জিহাদের উদ্দেশ্যেই প্রতিষ্ঠিত হয়েছিল। এর বুনিয়াদ জিহাদ। কিন্তু সে জিহাদ এখন আর নেই। এখন ইলম হাসিলের চর্চাই বাকি আছে।

এ সব আলোচনার উদ্দেশ্য দীনের এ সব বড় বড় খেদমতকে অস্বীকার করা নয়, বরং ইকামাতে দীনের গুরুত্ব বুঝানো। দীনের আসল উদ্দেশ্য যারা বুঝে তারা রাসূল (স)-এর পর খোলাফায়ে রাশেদীন ও সাহাবায়ে কেরামকেই শ্রেষ্ঠ মর্যাদা দেয় এবং তাঁরা ইকামাতে দীনের যে বিরাট দায়িত্ব পালন করেছেন, সেটাকেই সবচেয়ে বড় দীনী কাজ কনে করেন। কিন্তু বর্তমানে দীনের ঐ বড় দায়িত্বের ভিত্তিতে মর্যাদা দেওয়া হয় না। কারণ ইকামাতে দীনের সঠিক ধারণা এখন আলেম সমাজে পর্যন্ত ব্যাপক নয়। ব্যক্তিগত দীনদারীই এখন ভক্তি শ্রদ্ধার মাপকাঠি। এ কারণেই খোলাফায়ে রাশেদীনের চর্চার চেয়ে পরবর্তীকালের সূফীগণের চর্চা সমাজে বেশি দেখা যায়।

সমাপ্ত

www.bjilibrary.com

কামিয়াব প্রকাশন-এর বই

কামিয়াব প্রকাশন কর্তৃক প্রকাশিত সৃজনশীল বইসমূহ একদামে বিক্রি করা হয়

ফিক্‌হুস সিরাত (অনূদিত)	-মুহাম্মদ আল গাযালী আল মিসরী	২০০.০০
জীবনে যা দেখলাম (প্রথম খণ্ড)	-অধ্যাপক গোলাম আযম	১২০.০০
জীবনে যা দেখলাম (দ্বিতীয় খণ্ড)	-অধ্যাপক গোলাম আযম	১২০.০০
জীবনে যা দেখলাম (তৃতীয় খণ্ড)	-অধ্যাপক গোলাম আযম	১২০.০০
মযবুত ঈমান	-অধ্যাপক গোলাম আযম	৭.০০
জীবন্ত নামায	-অধ্যাপক গোলাম আযম	১০.০০
আল্লাহর খিলাফত কায়েমের দায়িত্ব ও পদ্ধতি	-অধ্যাপক গোলাম আযম	১০.০০
বিয়ে তালাক ফারায়েয	-অধ্যাপক গোলাম আযম	১৫.০০
রাষ্ট্র-ক্ষমতার উত্থান পতনে আল্লাহ তাআলার ভূমিকা	-অধ্যাপক গোলাম আযম	৫.০০
কুরআনের পরিভাষা	-ডক্টর মুহাম্মদ মুস্তাফিজুর রহমান	৯০.০০
মুসলিম ধর্মতত্ত্বে ইমাম গাযালীর অবদান	-ডক্টর মুহাম্মদ আবদুল্লাহ	৬০.০০
আধুনিক শিক্ষা বিস্তারে বাংলার কয়েকজন মুসলিম দিশারী	-ডক্টর মুহাম্মদ আবদুল্লাহ	১৪০.০০
শব্দ ধানুকী নজরুল	-শাহাবুদ্দিন আহমদ	১৪০.০০
নজরুলের নানান দিক	-শেখ দরবার আলম	১৬০.০০
আল্লাহর প্রতি ঈমান ও তার দাবি	-আল্লামা দেলাওয়ার হোসাইন সাঈদী	৮০.০০
আশারাহ মুবাশ্‌শারাহ	-এ জেড এম শামসুল আলম	১১০.০০
চাকরী পদোন্নতি ও পেশাগত সাফল্য	-এ জেড এম শামসুল আলম	১১০.০০
আধুনিক ব্যাংকিং	-ইকবাল কবির মোহন	১৬০.০০
সাইয়েদ কুতুব ঃ জীবন ও কর্ম	-আব্দুল্লাইয়ান মুহাম্মদ ইউনুছ	১০০.০০
আল মুনীর সিয়াম স্মারকগ্রন্থ	মুহাম্মদ হেলাল উদ্দীন সম্পাদিত	৬০.০০
মানুষের শেষ ঠিকানা	-আব্দুল্লাইয়ান মুহাম্মদ ইউনছ	১৪০.০০
ইসলামী সংগঠনে আনুগত্য পরামর্শ ইহতিসাব	মাওলানা দেলোয়ার হোসাইন	২৫.০০
হিমালয় দুহিতার উষ্ণতায়	-সালমান আযামী	৪০.০০
বেসরকারি শিক্ষা প্রতিষ্ঠান ব্যবস্থাপনা	-মোহাম্মদ শাহ আলম	৪৬০.০০
বেসরকারি কলেজ ব্যবস্থাপনা	-মোহাম্মদ শাহ আলম	২২০.০০
বেসরকারি বিদ্যালয় ব্যবস্থাপনা	-মোহাম্মদ শাহ আলম	১৪০.০০
বেসরকারি মাদরাসা ব্যবস্থাপনা	-মোহাম্মদ শাহ আলম	১২০.০০
দেশ সমাজ রাজনীতি	-শাহ আব্দুল হান্নান	১০০.০০
ইবনে বতুতার সফরনামা	-মুহম্মদ জালালউদ্দীন বিশ্বাস অনূদিত	১২০.০০
যমুনার ধারা বহে	-মুহম্মদ জালালউদ্দীন বিশ্বাস	১০০.০০
ইসলামী ম্যানিউআল	-মুহাম্মদ নূরুল ইসলাম	২০০.০০
হযরত মুহম্মদ (স) ও ভারতীয় ধর্মগ্রন্থ (অনূদিত)	-ডক্টর এম এ শ্রীবাস্তব	৩৫.০০
পরকাল ও তার প্রমান	সৈয়দ হামিদ আলী	৩০.০০
মাসাইল সংকলন	-মুহাম্মদ হিফযুর রহমান	১০০.০০